সুদ

- একটি ভয়ংকর অভিশাপ ও পরিত্রাণের উপায়
- প্রসঙ্গ : জি জি এন ও ডেসটিনি

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

সূদ

- এক ভয়ংকর অক্টোপাস
- পরিত্রাণের উপায়
- মাল্টি লেভেল মার্কেটিং

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-২৮
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

১ম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃষ্টাব্দ
ছফর ১৪৩০ হিজরী
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা

২য় সংস্করণ
এপ্রিল ২০১০ খৃষ্টাব্দ
জুমাঃ উলাঃ ১৪৩১ হিজরী
বৈশাখ ১৪১৭ বাংলা

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

Shud by Shah Muhammad Habibur Rahman, Professor, Department of Economics, University of Rajshahi. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. Mob: 01770-800900. H.F.B. Pub. No. 28. Price: Tk. 25 only.

Contents

প্রকাশকের কথা

সূদ হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পৃথিবীর আদিকাল থেকে সূদ ভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থা চলে আসছে। যার মন্দ প্রেরণা হচ্ছে ঋণ গ্রহীতাকে বাগে পেয়ে শোষণ করা। এর ফলে বিপদগ্রস্ত মানুষকে ঋণ দিয়ে উপকার করার মানবিক তাকীদ ধ্বংস হয়ে যায়।

সকল নবী ও রাসূল এবং মুসলিম-অমুসলিম সকল মনীষী যুগে যুগে সূদকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং সূদ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন। মদীনায় ইসলামী খিলাফতের সময়ে মানুষ প্রথম সূদবিহীন ইসলামী অর্থনীতির সুফল ভোগ করে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে আরবের কোথাও যাকাত নেওয়ার মত গরীব এবং হকদার খুঁজে পাওয়া যেত না। আজও সেটা সম্ভব যদি জনগণ সচেতন হয় এবং সেভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো হয়।

বাংলাদেশের জনগণকে সূদের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এজন্য আমরা দেশের খ্যাতনামা ইসলামী অর্থনীতিবিদ এবং বিগত ২৫ বছর যাবত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরী'আহ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানের মূল্যবান তিনটি নিবন্ধ, যা ইতিপূর্বে মাসিক আত-তাহরীকে (অক্টোবর ২০০১, মার্চ ও মে ২০০৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা লেখক কর্তৃক পুনরায় সংশোধন করে বই আকারে বের করতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

পবিত্র কুরআনের সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা সূদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদের অর্থ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার শেষ পরিণতি হ'ল দরিদ্রতা *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)।* অথচ বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে সূদী অর্থনীতি চালু রয়েছে। সূদের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে একদিকে সরকার পিটাচ্ছে ও জেল খাটাচ্ছে, অন্যদিকে গ্রাম্য সূদী মহাজন ও এনজিও-র লোকেরা ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কেউবা ঋণভারে জর্জরিত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ গাছে বেঁধে রেখে অন্যদের ভয় দেখাচ্ছে। এসব দুনিয়াবী যুলুমের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে ঈমানদারগণকে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যদি এর দ্বারা সরকার ও জনগণ হুঁশিয়ার হন এবং সূদ থেকে বিরত হন এবং সর্বোপরি আল্লাহ আমাদের এ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা কবুল করেন, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। মাননীয় লেখক লেখাটিকে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'কে দান করেছেন। আল্লাহ তাঁকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

পরিচালক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم أما بعد:

ভূমিকা

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সূদ তাদের মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন, সকল বিচারেই সূদের কাছাকাছি কোন সমাজবিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। ইলাহী গ্রন্থ তাওরাতের যে অংশটি বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' নামে পরিচিত তা থেকেই জানা যায় সূদের প্রচলন হয়েছিল আরও অতীতে। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর পূর্বেও সূদ বিদ্যমান ছিল। আজও সেই সূদ অপ্রতিহত গতিতে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সূদকে সব সময়েই কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, সূদখোরদের সামাজিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সূদ বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে যুগে যুগে। কোন ইলাহী গ্রন্থেই সূদের লেনদেনকে সমর্থন করা হয়নি, বৈধতা দেওয়া হয়নি।

সূদের সংজ্ঞা :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূদকে সর্বৈব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল ও সূদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

কেন এই ঘোষণা? রিবা (الربوا) বা সূদকে কেন হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল? এজন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন রিবা বা সূদ কি? রিবা কাকে বলে? আরবী 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে হারাম বা নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক উমর চাপড়ার মতে- শরী'আতে রিবা বলতে ঐ অর্থকে বোঝায়, যা ঋণের শর্ত হিসাবে মেয়াদ শেষে ঋণগ্রহীতা মূল অর্থসহ অতিরিক্ত অর্থ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, জাহেলী যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচলিতও ছিল। সে যুগেও তারা প্রথাসিদ্ধভাবে ঋণ দিত এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত, কিন্তু আসলের পরিমাণ থাকত অপরিবর্তিত। যখন ঋণের মেয়াদ শেষ হ'ত এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হ'ত তখন সূদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ত *(তাফসীরুল কাবীর)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হ'ল রিবা। ইমাম আবুবকর আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে, অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই জাহেলী যুগের রিবা। তিনি আরও বলেন, জাহেলী যুগে ঋণ গ্রহণের সময়ে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হ'ত। তাতে স্বীকার করে নেওয়া হ'ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের উপর একটি নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল মূলধন ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে।

প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, 'জাহিলী যুগে প্রচলিত ও কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হ'ল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা'। আরবরা তাই-ই করত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সূদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত *(তাফসীর ইবনে জারীর)*।

এখানে একটি ভুল বোঝাবুঝির নিরসন হওয়া প্রয়োজন। অনেকে কুরআন ও হাদীছে যে রিবার উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ করেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দেওয়া ঋণের বিনিময়ে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বা Usury। এদের মতে, ব্যবসায়িক কাজে লগ্নিকৃত অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় বাড়তি অর্থ বা Interest এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের মতে Usury বা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ আদায় নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হ'তে পারে। কারণ এতে শোষণ ও পীড়নের সুযোগ বা আলামত রয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত অর্থ বা আজকের দিনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

কর্তৃক আদায়কৃত সূদ বা Interest নির্দোষ। কেননা এখানে কারো উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ব্যবসায়িক লেনদেনের মতোই উভয়ের সম্মতিক্রমেই সূদের হার স্থিরীকৃত হচ্ছে। এই সূদও সরল সূদ এবং হারও যথেষ্ট কম, সাধারণত ৮%-১৮%। উপরন্তু এই ঋণে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয়। ফলে ঋণগ্রহীতার আয়ও বৃদ্ধি পায়। তার পক্ষে তাই 'মূলধনের সময়ের প্রাপ্য' পরিশোধ করাই যুক্তিযুক্ত। তাদের দৃষ্টিতে এখানে কোন যবরদস্তি বা যুলুমের উপাদান বিদ্যমান নেই। বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থের যে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় সূদ গ্রহণের ফলেই তা পূরণ হয়। ফলে মূলধন অবিকৃত থাকে।

তিনটি কারণে এই ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ সমগ্র আরব দেশে আরবী 'রিবা'(الربـــوا) শব্দের অর্থ সূদই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর কোন বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা ভিন্ন কোন অর্থ প্রযুক্ত হয়নি। তাই সূদের ভিন্নতা বা প্রকারভেদ বোঝার জন্য ইংরেজী, বাংলা বা অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করে অযৌক্তিক ধুম্রজাল সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। উদাহরণতঃ ইসলামে সূদ যেমন হারাম, মদও তেমনি হারাম। তাই একটা গ্লাসের পুরোটাই রঙিন মদে ভর্তি ও আরেকটা গ্লাসের তলায় রাখা ও সাদা রঙের কিঞ্চিৎ মদের মধ্যে আসলেই প্রকৃতিগত বা বস্তুগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য রঙের ও পরিমাণের। Interest ও Usury এর পার্থক্যও তাই মাত্রাগত, গুণগত নয়।

দ্বিতীয়তঃ জাহেলী যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রীতিমত পুঁজি লগ্নী করা হ'ত এবং সেজন্য সূদ আদায় করা হ'ত। সে সময়ে অনেকেই আজকের মত ফার্ম খুলে এজেন্ট নিয়োগ করে সূদে পুঁজি খাটাত। এদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ও বনু মুগীরার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তাদের আদায়কৃত সূদকে আরবীতে রিবা-ই বলা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচার সূদী কারবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং খাতকের কাছে প্রাপ্য বকেয়া সূদ রহিত করে দিয়েছিলেন।[১]

---

১. *আবুদাঊদ হা/১৯০৫।*

তৃতীয়তঃ যারা 'মূলধনের সময়ের প্রাপ্য' পরিশোধ করতে বলেন তাদের আচরণ গল্পের সেই একচোখা হরিণের মতই। মূলধনের সময়ের প্রাপ্য যদি ঋণদানকারীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় তাহ'লে ঋণ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? তার তো বরং সময়, মেধা ও শ্রম সবই একই সময়ে ঐ অর্থের পেছনে খাটছে। এছাড়া যারা বলেন, অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সূদ নেওয়া প্রয়োজন, তারা ভুলে যান যে শুধুমাত্র সূদ আদায় করেই অর্থের ক্রয়ক্ষমতা স্থির রাখা যায় না। এজন্য আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যরূরী। তাই যারা Interest ও Usury-কে ভিন্ন বিষয় হিসাবে দেখতে চান তারা আসলে বিশেষ মতলব হাছিলের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন।

এ বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই। বিশেষতঃ রাসূলপূর্ব জাহেলী যুগে এবং আরবী ভাষায় যে অর্থে রিবার ব্যবহার হ'ত তা Interest ও Usury উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। এ ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমতে পৌঁছেছেন।[২]

বস্তুতঃ ইসলামে যে সূদ হারাম বলে গণ্য সে সূদ যত রকম নামেই পরিচিত হোক না কেন এবং তা প্রাপ্তির জন্য যে পথ বা উপায়ই অবলম্বন করা হোক না কেন তা সবই হারাম।

মনে রাখা দরকার, যে সময়ে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল সে সময়ে আরব সমাজে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণের উপর সূদ আদায় করা হ'ত, তেমনি ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপরও সূদ গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। এই উভয় প্রকার সূদকেই তখন আরবী ভাষায় 'রিবা' বলা হ'ত এবং কুরআনে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

---

২. T.B. Hughes, *A Dictionary of Islam,* (Premier Book House, 1985), p. 544; Adam Kupar & Jessica Kupar, *The Social Sciences Encyclepaedia,* (Routledge & Kegan paul, 1985), p. 405-406; *Encyclopaedia Judiace,* (Jerusalem, 1972), Vol. 16. p. 28; Raymond De Rover, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, London, vol. 4, p. 434; Henry, W. Spigel, *A Dictionary of Economics,* (Macmillan, 1987), Vol. IV, p. 769.

সূদের বৈশিষ্ট্য :

এই আলোচনা হ'তে সূদের চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হ'ল-

(ক) সূদের উদ্ভব হয় ঋণের ক্ষেত্রে।

(খ) ঋণ পরিশোধের সময়ে পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে।

(গ) প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ ও গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য একটা সময়সীমা ঋণগ্রহণের সময়েই নির্ধারিত হবে।

(ঘ) ঋণগ্রহীতার কোন ক্ষয়-ক্ষতি, লাভ-লোকসান বা ঝুঁকি কোনভাবেই বিবেচনার বিষয় বলে গণ্য হবে না।

সূদের প্রকারভেদ :

ইসলামী শরী'আহ অনুসারে রিবা দুই ধরনের (ক) রিবা আন-নাসিআহ (الربوا النسيئة) ও (খ) রিবা আল-ফাযল (الربوا الفضل) ।

(ক) **রিবা আন-নাসিআহ** হ'ল বাকীতে ঋণের সূদ। অর্থাৎ ঋণের সেই মেয়াদকালকে বলা হয়, যা ঋণদাতা মূল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণগ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ক এক বছরের জন্য খ-কে টাঃ ১০০/= দিল এই শর্তে যে, সে তাকে টাঃ ১০০/= এর সাথে অতিরিক্ত আরও ১০/= যোগ করে ফেরৎ দিবে। এই অতিরিক্ত টাঃ ১০/= ই হ'ল 'রিবা আন-নাসিআহ' বা প্রতীক্ষার সূদ।

(খ) **রিবা আল-ফাযলের** উদ্ভব হয় পণ্যসামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশী পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হ'লে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় **রিবা আল-ফাযল**। 'ফাযল' অর্থ অতিরিক্ত।

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা বিলাল (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সমীপে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে হাযির হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমাদের খেজুর নিকৃষ্টমানের ছিল। আমি তার দুই ছা'-এর বিনিময়ে এক ছা' উন্নতমানের 'বারমী' খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَـــا لاَ

تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمَرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِــهِ، 'ওহ! এতো নির্ভেজাল সূদ, এতো নির্ভেজাল সূদ। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহ'লে নিজের খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর উন্নতমানের খেজুর কিনে নিবে'।[৩]

অন্য এক হাদীছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلذَّهَبُ بَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمَــرُ بِالتَّمَرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، اَلْآخِذُ وَالْمُعْطِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ،

'সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে হাতে হাতে। যে ব্যক্তি বেশী দিয়েছে বা নিয়েছে সে সূদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান'।[৪]

তাই ইসলামে এই ধরনের লেনদেন তথা রিবা নিষিদ্ধ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হ'ল, তাৎক্ষণিক স্থানীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষে সুবিচার ও যথাযথ বিনিময় সম্ভব নাও হ'তে পারে। তাই শরী'আতের হুকুম হ'ল নির্ধারিত পণ্যটি প্রথমে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হবে।

সূদ ও মুনাফার পার্থক্য :

অনেকে সূদ ও মুনাফাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেন। এমনকি 'সূদ তো মুনাফার মতই' এতদূর পর্যন্তও বলতে কছূর করেন না। এজন্যই এ দু'য়ের পার্থক্য সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নীচে তুলে ধরা হ'ল।

(ক) সূদ হ'ল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। পক্ষান্তরে মুনাফা হ'ল উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

---

৩. *বুখারী হা/২৩১২, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১৪।*

৪. *মুসলিম হা/১৫৮৪, মিশকাত হা/২৮০৯; ঐ বঙ্গানুবাদ ৬/১৯ পৃঃ হা/২৬৮৫।*

(খ) সূদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে।

(গ) সূদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হয়ে লোকসানও হ'তে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

(ঘ) সূদ কখনই ঋণাত্মক হ'তে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হ'তে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসান) হ'তে পারে।

(ঙ) সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।

অন্যান্য ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সূদ :

কুরআন নাযিলের পূর্বে অন্যান্য যেসব আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল, সেসবেও সূদ নিষিদ্ধ ছিল। ঐসব গ্রন্থ আজ আর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। একমাত্র আল-কুরআনই রয়েছে অবিকৃত অবস্থায়, থাকবেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দাঊদ (আঃ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ 'যাবূর'-এর কোন সন্ধান মেলে না। মূসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হওয়া 'তাওরাত' ও ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হওয়া 'ইনজীল'-এর যে বহু বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যুগে যুগে, একথা তো সর্বজনবিদিত। তারপরও ইনজীল বা বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা আদিপুস্তক তাওরাতেরই অংশবিশেষ বলে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ দাবী করেন। সেই আদিপুস্তকেই সূদ সম্বন্ধে যে ঘোষণা ও নির্দেশনা রয়েছে তা এ যুগের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণত-

(১) 'তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দাও তবে তাহার কাছে সূদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা তাহার উপর সূদ চাপাইবে না' *[(Exodus) যাত্রাপুস্তক; ২২: ২৬]*।

(২) 'তুমি তাহা হইতে সূদ কিংবা বৃদ্ধি লইবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিবে... তুমি সূদের জন্য তাহাকে টাকা দিবে না' *[(Leviticus) লেবীয় পুস্তক, ২৫: ৩৬-৩৭]*।

(৩) 'তুমি সূদের জন্য, রৌপ্যের সূদ, খাদ্য সামগ্রীর সূদ, কোন দ্রব্যের সূদ পাইবার জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না' *[(Deuteronomy) দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩: ১৯]*।

(৪) 'যে সূদ ও বৃদ্ধি লইয়া আপন ধন বাড়ায়... তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ' *[(Ecclesiastes) হিতোপদেশ, ২৮: ৮-৯]*।

(৫) 'যে সূদের জন্য টাকা ধার দেয় না... সে কখনও বিচলিত হইবে না' *[(The Psalm) গীতসংহিতা, ১৫: ৬]*।

(৬) 'পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ধার্মিক হয়... সূদের লোভে ঋণ দেয় নাই, কিছু বৃদ্ধি লয় নাই... তবে সেই ব্যক্তি ধার্মিক, সে অবশ্য বাঁচিবে' *[(Ezekiel) যিহিস্কেল, ১৮: ৮-৯]*।

(৭) 'যদি সূদের লোভে ঋণ দিয়া থাকে ও বৃদ্ধি লইয়া থাকে তবে সে কি বাঁচিবে? সে বাঁচিবে না; সে এই সকল ঘৃণার্হ কার্য করিয়াছে' *[(Ezekiel) যিহিস্কেল, ১৮: ৯৩]*।

খৃষ্টধর্মের শুরু হ'তে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হ'তে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সূদ নিষিদ্ধ ছিল। সকল চার্চই তখন এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করত। মধ্যযুগে ইউরোপের চার্চ অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার জন্য সূদখোরদেরকে দেহপসারিণীদের সমতুল্য গণ্য করেছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রখ্যাত দার্শনিক ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণও সূদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তারা সূদের অশুভ পরিণতি তুলে ধরেছেন এবং সূদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। **এ্যারিস্টটল** তাঁর *Politics* গ্রন্থে সূদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা এক ধরনের জালিয়াতি। সুতরাং, সূদের কোন বৈধতা থাকতে পারে না। **প্লেটো** তাঁর *Laws* নামক গ্রন্থে সূদের নিন্দা করেছেন। **থমাস একুইনাস** সূদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহারকে পৃথক করা যায় না। অর্থের ব্যবহার করা মানে অর্থ খরচ করে ফেলা। এক্ষেত্রে একবার অর্থের ব্যবহারের মূল্য নেয়ার পর অর্থাৎ মুনাফা গ্রহণের পর পুনরায় অর্থের মূল্য নেওয়া হলে একই দ্রব্য দু'বার বিক্রি করার অপরাধ হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অবিচার'। সূদকে

সময়ের মূল্য বলে যারা দাবী করেন তাদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ যার উপর ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা ও অন্যান্য সকলেরই সমান মালিকানা বা অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় শুধু ঋণদাতার সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি অসাধু ব্যবসা বলে অভিহিত করেছেন। **হিন্দু ধর্মেও** সূদ গ্রহণকে সমর্থন করা হয়নি *(মনুসংহিতা, ৮ম অধ্যায়, শ্লোক নং ১০২)*। বৃহদ্ধর্ম পুরানেও সূদকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে *(উত্তর খণ্ড, শ্লোক নং ৬৩)*।

পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক এবং সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক প্রবক্তা **কার্ল মার্কসও** সূদ ও সূদখোরদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন (দ্রঃ *Capital.* Vol. 2)। তিনি অর্থনীতি হ'তে সূদ উচ্ছেদ, সূদখোরদের কঠোর শাস্তি প্রদান ও তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। অর্থ বা মুদ্রাকে তিনি সমাজ শোষণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছেন। এজন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে যুদ্ধ সাম্যবাদ চলাকালীন সময়ে (১৯১৮-২২) পুঁজিবাদী অর্থনীতি উৎখাতের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে রাশিয়ার মুদ্রা রুবল পর্যন্ত অর্থনৈতিক লেনদেন হ'তে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।[৫]

পল মিলস ও জন প্রিসলে বলেন, ইতিহাসের কালপরিক্রমায় দেখা যায় অন্যের দুর্ভাগ্য হ'তে 'মুনাফা' অর্জনের জন্য ইহুদী সূদখোরদের নিন্দা করা হয়েছে। প্লুটার্ক বিশ্বাস করতেন বিদেশী আক্রমণকারীদের চাইতে অর্থ ঋণদানকারীরা অধিক নির্যাতনকারী। সূদখোররা তাদের প্রবাদতুল্য অর্থগৃধ্নুতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থলোলুপতার জন্য বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় বিদ্রূপের খোরাক হয়ে রয়েছে। ইতালীর অমর কবি দান্তে সূদখোরদের নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে নিক্ষেপের কথা বলেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট সেক্সপীয়রের *দি মার্চেন্ট অব ভেনিস* নাটকের শাইলক ও মলিয়েরের *দি মাইজার* নাটকের হারপাগণের নাম কে না শুনেছে? বাংলা সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসে সূদখোরদের শোষণ-পীড়নের কাহিনীর উল্লেখ একেবারে অপ্রতুল নয়। রবীন্দ্রনাথের *কাবুলিওয়ালা,*

---

৫. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য E.H. Carr- The Bolshevik Revolution, Vol. 2, Ch. 17; Macmillan, 1952.*

শওকত ওসমানের *ইতা* প্রভৃতি গল্প এবং কাজী ইমদাদুল হকের আব্দুল্লা, অদ্বৈত মল্ল বর্মনের তিতাস একটি নদীর নাম প্রভৃতি উপন্যাস তার প্রমাণ।

সূদ ও ইসলাম :

সূদ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান সবচেয়ে কঠোর ও অনমনীয়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেই সূরা বাক্বারাতে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরাতেই আরও বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সূদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তোমরা তা না করো তাহ’লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ’তে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন ফিরিয়ে নিতে পারবে। না তোমরা যুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*।

ক্বিয়ামতের দিন সূদখোরদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে ঐ সূরাতেই বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا-

‘যারা সূদ খায় তারা ক্বিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তি যার উপর শয়তান আছর করে। তাদের এ অবস্থার কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সূদ নেওয়ারই মতো’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

সূদের লেনদেন ও সূদের সাথে সংশ্রব রাখা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَـــوَاءٌ- ‘যারা সূদ খায়, সূদ দেয়,

সূদের হিসাব লিখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং এরা অপরাধের ক্ষেত্রে সকলেই সমান'।[৬]

পবিত্র কুরআনে বহু ধরনের গুনাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। সেসবের জন্য কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সূদের ক্ষেত্রে যত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য কোন গুনাহের ব্যাপারে এমনটি করা হয়নি। এজন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সূদ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (ছাঃ) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে তিনি যে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে পাঠান- 'যদি তোমরা সূদী কারবার করো তাহ'লে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে'। বনু মুগীরার সূদী লেনদেন সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রাপ্য সমুদয় সূদ বাতিল করে দেন এবং মক্কায় তাঁর নিযুক্ত তহসীলদারদেরকে লিখে পাঠান, যদি তারা (বনু মুগীরা) সূদ গ্রহণ করা বন্ধ না করে তাহ'লে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

রিবার অবৈধতা আল-কুরআনের সাতটি আয়াত (বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৮০; আলে ইমরান ১৩০ এবং রূম ৩৯) এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ তুলে ধরা হ'ল-

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ– 'সূদের (পাপের) সত্তরটি স্তর রয়েছে। যার নিম্নতম স্তর হ'ল মায়ের সাথে যেনা করার পাপ'।[৭]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلاَثِيْنَ زِنْيَةً، 'কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) রিবা বা সূদ জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে, তাতে তার পাপ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও অনেক বেশী হয়'।[৮]

---

৬. *মুসলিম হা/১৫৯৮, মিশকাত হা/২৮০৭;* বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬/১৯ পৃঃ হা/২৬৮৩।
৭. *ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৮২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭০২।*
৮. *আহমাদ হা/২২০০৭, মিশকাত হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭০১।*

(৩) কূফার ক্বাযী খ্যাতনামা তাবেঈ আবু বুরদা বিন আবু মূসা বলেন, আমি মদীনায় এলাম এবং ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি এমন এক এলাকায় বাস কর, যেখানে সূদ ব্যাপকহারে প্রচলিত। অতএব যদি কারু নিকট তোমার কোন পাওনা থাকে, আর সে যদি তোমার নিকট এক থলে ভূষি বা যব কিংবা এক আঁটি ঘাসও উপঢৌকন দেয়, তবুও তুমি তা গ্রহণ করো না। কেননা ওটা হবে ‘রিবা’ বা সূদ’।[৯]

(৪) আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ، ‘তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অভিশাপ করতে শুনেছেন সূদখোরের প্রতি, সূদ দাতার প্রতি, সূদের প্রমাণপত্র লেখকের প্রতি ও ছাদাক্বা প্রদানে বাধাদানকারীর প্রতি। আর তিনি নিষেধ করতেন মৃতের জন্য বিলাপ করা হ’তে’।[১০]

(৫) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُــــلٍّ، ‘সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা।[১১]

উপরোল্লিখিত হাদীছসমূহ থেকে সূদ সম্পর্কে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। এসবের মধ্যে রয়েছে সূদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা মহাপাপী বলে গণ্য হবে। সামান্য বিষয় এমনকি ঋণদাতাকে উপহার প্রদানও সূদ হিসাবে বিবেচিত হবে। সূদের শেষ পরিণতি হবে নিঃস্বতা। সূদ বহু প্রকারের হ’তে পারে। এক সময়ে সূদ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তা থেকে কারো রেহাই থাকবে না। সূদের গুনাহ (যা কবীরা গুণাহ) অতীব নিকৃষ্ট ধরনের ইত্যাদি। তাই সূদ প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ সতর্কতা

---

৯. *বুখারী হা/৩৮১৪, মিশকাত হা/২৮৩৩।*

১০. *নাসাঈ হা/৫১০৩, মিশকাত হা/২৮২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭০৫।*

১১. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭০৩, ৬/২৭ পৃঃ।*

অবলম্বন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজদেহ হ'তে সূদ উচ্ছেদ ও রহিত করার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণও সমান প্রয়োজন।

বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলেননি। তিনি যে প্রকৃতই রহমাতুল্লিল আলামীন, তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণেও তার পরিচয় রেখে গেছেন। অবিস্মরণীয় সেই ভাষণে তিনি একটিমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে শোষণের বিষদাঁত চিরতরে ভেঙ্গে দিলেন। অবিচল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 'জাহেলী যুগের সমস্ত সূদ বাতিল করা হ'ল। সবার আগে আমাদের গোত্রের আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের সব সূদ আমিই রহিত করে দিলাম'।[১২]

সেই ঘোষণার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত পরবর্তী যুগেও বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ নয়শত বছর ইসলামী হুকুমত বহাল থাকাকালীন কোথাও সূদ বিদ্যমান ছিল না। সূদের মাধ্যমে কোন লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়নি। পরবর্তীতে মুসলমানদের ভোগবিলাস ও আত্মবিস্মৃতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের পরাভূত করে ধ্বংস করে দেয় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। বিপরীতে মুসলিম দেশ ও সমাজ কোন প্রতিরোধ তো গড়তে পারেইনি বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে যোজন যোজন পথ। এই সময়েই ইউরোপে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে নতুন আঙ্গিকে সূদ পুনরায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিশ্বের সকল দেশে, সমাজের সর্বস্তরে। ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই। ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজে সূদের সর্বনাশা শোষণ ও ধ্বংস আরও গভীর ব্যাপ্তি লাভ করে। একদিকে পুঁজি আবর্তিত হ'তে থাকে শুধু ধনীদের মধ্যেই, যা পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সূদের কারণে আরও নতুন নতুন অর্থনৈতিক নির্যাতন ও শোষণ বিস্তৃতি লাভ করে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে, যার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ আজ আর সহজসাধ্য নয়।

---

১২. *মুসলিম হা/১২২৮, মিশকাত হা/২৫৫৫, তারীখে ত্বাবারী; সীরাতে ইবনে হিশাম*।

সূদের কুফল

মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা হ'তে সূদের ছোট-বড় অন্ততঃ পঞ্চাশটি কুফলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলোকে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেসবের পুনরুক্তি না ঘটিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কুফলের প্রসঙ্গে না গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুফলগুলো সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।-

ক. নৈতিক ও সামাজিক কুফল

১। সূদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম :

একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সূদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সূদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে অনেক সময় ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হ'লেও সূদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। পরিণামে সে আরও দরিদ্র হয়। সমাজে শ্রেণীবৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ সূদ গ্রহীতারা সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবনযাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থ লাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

২। সূদ মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ বানায় :

অর্থলিপ্সা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা সূদখোরদের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনাশ্রমে উপার্জনের আকাঙ্খা ও অর্থলিপ্সা হ'তেই সূদ প্রথার জন্ম। সূদের মাধ্যমে নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয় প্রাপ্তির লোভ সূদখোরদের বিচার-বিবেচনা, আবেগ-অনুভূতি এমনকি বিবেককে পর্যন্ত নিঃসাড় করে দেয়। সূদখোরদের মধ্যে লোভ ও স্বার্থপরতা ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রসার লাভ করে, তাদের আচার-আচরণের এতখানি পরিবর্তন ঘটে যে, তারা হয়ে ওঠে সমাজের পরিহাসের পাত্র। তাদের প্রবাদতুল্য লোভ, পরের সম্পদ ও বিত্ত গ্রাসের প্রবণতা গল্প-কাহিনীর খোরাক হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে সেসব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। যারা সূদ দিতে সক্ষম তাদের জন্য মহাজন ও সূদী

ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসে ঋণের পসরা নিয়ে। কিন্তু যারা সূদ দিতে অপারগ তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা, অনেক সময়ে মৌখিক সহানুভূতিটুকু পাওয়াও হয়ে ওঠে না।

৩। সূদ শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে :

সূদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে কোন পরিশ্রম ও ঝুঁকি ছাড়াই সূদের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে অর্থ পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান ও কর্মঠ লোককেও অকর্মণ্য ও অলস বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা স্থাপন অর্থাৎ উৎপাদনধর্মী কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার সূদভিত্তিক সঞ্চয়কারীরা তা আর করে না। বরং ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হ'তে বিনাশ্রমে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হারে আয় পেয়ে তারা পরিতৃপ্ত থাকে। ধীরে ধীরে আলস্য তাদের গ্রাস করে। এভাবে সূদের কারণেই যাদের হাতে অঢেল বিত্ত রয়েছে তাদের শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ফসল হ'তে সমাজ বঞ্চিত হয়। সৃষ্টি হয় শ্রমবিমুখতা ও অলসতা। এদেশের সাহিত্যে এর ভুরি ভুরি নজীর মিলবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সূদী ব্যবস্থায় কেউ ব্যাংকে দশ লাখ টাকা মেয়াদী জমা রেখে কোন রকম শ্রম, ঝুঁকি বা দুশ্চিন্তা ছাড়াই ঘরে বসে প্রতি মাসে ন্যূনতম দশ হাযার টাকা পেতে পারে।

৪। সূদ স্বল্প লাভজনক সামাজিক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে :

সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তা উৎপাদনমুখীই হোক আর সেবামূলকই হোক, একই হারে মুনাফা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফার হার সূদের হারের চেয়ে বেশী, কোথাও সমান, আবার কোথাও বা কম। সাধারণভাবে বিলাস সামগ্রী ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর খাতে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে মুনাফার হার হয়ে থাকে সর্বোচ্চ। প্রসাধনী ও বিলাস সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্য, মদ ও নেশার বস্তু এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও কল্যাণকর দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার ক্ষেত্রে মুনাফার হার প্রায়শঃই খুব কম হয়ে থাকে। এমনকি তা প্রদেয় সূদের হারের চেয়েও কম হ'তে পারে। ফলে সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে যেখানে মুনাফার হার সূদের হারের চেয়ে বেশী সেখানেই বিনিয়োগ হয় সর্বাধিক। অপরদিকে যেসব অত্যাবশ্যকীয় খাতে মুনাফার হার সূদের হারের সমান বা কম সেখানে

কোন বিনিয়োগকারী এগিয়ে আসতে আগ্রহী হয় না। কারণ গৃহীত ঋণের সূদ প্রদানের পর উদ্যোক্তার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। পরিণামে সামাজিকভাবে কাম্য সেবা ও দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহে সংকোচন ঘটে অনিবার্যভাবেই। অথচ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে যরূরী। যদি অর্থনীতিতে সূদ না থাকতো তাহ'লে বিনিয়োগকারীরা (এবং মূলধনের যোগানদারেরাও) প্রাপ্তব্য মুনাফাতেই (তার হার যত কমই হোক না কেন) পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিধা করতো না। ফলে সমাজের অপরিহার্য ও কল্যাণকর খাতের সম্প্রসারণ ও কর্মোদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হ'ত।

৫। **সূদ নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ :**

সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে নিশ্চিত আয়ের অর্থাৎ অবধারিতভাবে সূদ প্রাপ্তির লোভে অনৈতিক ও অনৈসলামী কাজে মূলধন বিনিয়োজিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মদের ব্যবসা, ফটকাবাজারী, মজুতদারী, অনৈতিক ও কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা, সিনেমা, এমনকি পর্ণোগ্রাফির মতো বিষয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। এসব কাজে যেহেতু মুনাফা অর্জিত হয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী হারে, সেহেতু প্রদেয় সূদ পরিশোধের পরও বিস্তর মুনাফা থেকে যায় উদ্যোক্তার হাতে। তাই তার পক্ষে চড়া হারেও সূদ পরিশোধ করা আদৌ কঠিন নয়। এই পথ ধরে সমাজে অনৈতিক ও অসামাজিক কাজের প্রসার ঘটে সহজেই। পরিণামে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীর সহজাত বোধ-বিশ্বাসে চিড় ধরে। ধীরে ধীরে তাদের ঈমানী চেতনার বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে। ক্রমেই মূল্যবোধের ক্ষয় হয় এবং প্রায় অলক্ষ্যেই সমাজে নৈতিক অধঃপতন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে। সমাজের অবক্ষয় তথা ধ্বংস হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য। বস্তুতই মুনাফার হার তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণে সমাজ হিতকর ও কল্যাণধর্মী প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্যে পুঁজি সংগ্রহ করা বর্তমান সময়ে অতীব দুরূহ কাজ।

৬। **সূদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে :**

সূদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা তাদের প্রদত্ত ঋণের বিনিময়ে হাযার হাযার লোকের কঠোর শ্রমের ফসলে অন্যায্য ভাগ বসায়। শুধু তাই নয়, অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য গৃহীত ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোন বাড়তি

আয়ের সুযোগ নেই সেহেতু এই ঋণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাদের সহায়-সম্পত্তির উপরেও চাপ পড়ে অনিবার্যভাবেই। এমনকি ঋণের দায়ে অনেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয়, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ওঠে নিলামে। মানুষের আপদকালে দাবীকৃত বাড়তি এই অর্থ অর্থাৎ সূদ তাই স্বভাবতই ঋণ গ্রহীতাদের সংক্ষুব্ধ করে তোলে। মানুষ তাদেরকে বিপদের দিনে দাতা মনে করার পরিবর্তে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারই মনে করে। এরা হয়ে ওঠে সমাজে ঘৃণার পাত্র।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকায় বাইতুল মাল হ'তে সাহায্য বা করযে হাসানা পাওয়ার কোন সুযোগ না থাকায় সূদভিত্তিক ঋণ নিতে বাধ্য হয় সমস্যাগ্রস্ত অসহায় নারী-পুরুষ। উপরন্তু সূদখোররা গরীব ও অসহায় কৃষকদের জমি-জিরাত ঋণের দায়ে দখল করে, ফসলের সূদ খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে ওঠে, হয়ে ওঠে বিপুল সম্পদের মালিক। কখনও কখনও এমনও দেখা যায়, গৃহস্থ চাষী, ক্ষুদে খামারের মালিক সূদখোর মহাজনের ঐ জমিতে বর্গাচাষ করতে বাধ্য হচ্ছে একদিন যে জমির মালিক ছিল সে নিজেই। স্বভাবতই তখন তার মনে সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ ও অসূয়ার যার পরিণাম ফল মোটেই শুভ নয়।

৭। **সূদের কারণেই দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরো ধনী হয় :**

সূদের পরিণামে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে উপায়ান্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সূদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সূদ পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে উত্তমর্ণ আরো ধনী হয়। অধমর্ণ হয় আরও দরিদ্র। বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য।

বাংলাদেশে একশ্রেণীর ধনী যে আরও ধনী হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সূদভিত্তিক ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ দানের নীতি ও

কৌশল। যোগ্যতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় জামানত দিতে না পারার কারণে সূদী ব্যাংকগুলো হ'তে ঋণ পায় না, অথচ বিত্তশালী ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তারা সহজেই ঋণ পায়। ব্যাংক হাযার হাযার লোকের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু ঐ অর্থ ঋণ আকারে পায় মুষ্টিমেয় বিত্তশালীরাই। এ থেকে উপার্জিত বিপুল মুনাফা তাদের হাতেই রয়ে যায়। ফলে সঞ্চয়কারী হাযার হাযার লোক তাদের অর্থের প্রাপ্য উচিত আয় থেকে বঞ্চিত হয়। বিত্তশালী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে সূদ পরিশোধ করে তা জনগণের কাছ থেকে সেবা ও দ্রব্যের মূল্যের সাথেই তুলে নেয়। ফলে ব্যাংকের দায় পরিশোধ করেও তাদের মুনাফার কোন কমতি হয় না, পরিণামে ধনীরা আরও ধনী হয়, গরীবরা হয় আরও গরীব। সমাজহিতৈষীরা তাই যতই 'গরীবী হঠাও' বলে চিৎকার করুক সূদের মতো এই দৃঢ়মূল, সুকৌশলী ও সর্বব্যাপী শোষণ প্রক্রিয়া বহাল থাকা অবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন প্রেসক্রিপশনই কার্যকর হবে না।

খ. অর্থনৈতিক কুফল

৮। **সূদের শোষণ সার্বিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক প্রকৃতির :**

সূদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্চয় সমাবেশ ও সঞ্চালনের সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই পুঁজি চড়া সূদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। একই সাথে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণীবৈষম্য। অর্থাৎ, শ্রেণীবৈষম্য হ্রাস না পেয়ে আরও ব্যাপক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সূদী ব্যাংকসমূহের অনেকগুলো তাদের প্রদত্ত সূদকে ক্ষেত্রবিশেষে 'মুনাফার' লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টাও করছে। ফলে প্রতারিত হচ্ছে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ।

সূদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শোষণ যে কত সার্বিক ও কৌশলপূর্ণ তা একটা উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা হ'ল। ব্যাংকে আমানতকারীরা যে অর্থ সঞ্চিত রাখে তার পুরোটা ব্যাংক কখনই নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে না। সাধারণতঃ ঐ অর্থের ৯০% ঋণ দিয়ে থাকে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের। তারা এই অর্থের জন্য ব্যাংককে যে সূদ দেয় তা আদায়

করে নেয় জনগণের নিকট হ'তেই তাদের প্রদত্ত সেবা ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যের সঙ্গেই। এদের মধ্যে ঐসব আমানতকারীরাও রয়েছে যারা ব্যাংকে অর্থ রেখেছে সূদের মাধ্যমে নিশ্চিত নিরাপদ আয়ের উদ্দেশ্যে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদায়কৃত সূদ হ'তে একটা অংশ ব্যাংক পরিচালনা ও শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ডের জন্য রেখে বাকি অংশ আমানতকারীদের হিসাবে জমা করে দেয় তাদের প্রাপ্য সূদ বাবদ। এভাবেই ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলো মাছের তেলে মাছ ভেজে নেয়। অন্যদিকে প্রতারিত হয় আমানতকারীরা। কিন্তু তারা কি কখনও তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায়? বরং বছর শেষে পাশ বই বা কম্পিউটারাইজড একাউন্ট শীটে যখন জমার বিপরীতে সূদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দেখে তখন তারা দৃশ্যতঃ পুলকিত বোধ করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা পরিস্কার করে তুলে ধরা যেতে পারে।

উদাহরণ-১

লেনদেনের বিবরণ	সূদের হার
ক. আমানতকারী (=ভোক্তা) ব্যবসায়ী/উৎপাদনকারীকে সূদ বাবদ মূল্যের আকারে প্রদান করে- খ. আমানতকারী ব্যাংক হ'তে সূদ বাবদ পায়-	১৬% -৮%
=(ক-খ) ব্যাংকে সঞ্চয়ের বিপরীতে আমানতকারীর নীট লোকসান দাঁড়ায়-	= ৮%

বিদ্যমান সূদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ও আইন এবং সমষ্টি অর্থনীতির (Macroeconomics) কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে কোনভাবেই এই অদৃশ্য অথচ প্রকৃতই লোকসান তথা শোষণ প্রতিরোধের উপায় নেই। এর প্রতিবিধান রয়েছে একমাত্র ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং পদ্ধতির কর্মকৌশলের মধ্যে।

৯। **সূদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে :**

কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। প্রয়োজনের সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া এদের জন্যে দুরূহ। তাই গ্রামেরই সচ্ছল লোকের দ্বারস্থ হয় তারা। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একদল লোক এদেরকে সাহায্য করার জন্যে তৈরীই থাকে। গ্রামাঞ্চলে এসব সূদখোররা সাধারণতঃ 'মহাজন' নামেই অধিক পরিচিত।

এরা শুধু গ্রামাঞ্চলেই আছে এমন নয়, নগরে-বন্দরে, গঞ্জে-মোকামেও এরা পরিচিত মুখ। এদের অনেকে আবার দাদন ব্যবসায়ী হিসাবেও পরিচিত। এরা প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, ক্ষুদে ব্যবসায়ী সকলকেই টাকা ধার দেয়, ধান যোগান দেয়। শর্ত থাকে ফসল উৎপাদনের মৌসুমের শুরুতে অথবা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নেওয়া ঋণের জন্যে ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে প্রতি হাযারে টাঃ ২০০/= হারে সূদ দিতে হবে। অথবা প্রতি মণ ধানের বদলে ঐ সময়ে দ্বিগুণ ধান দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যুক্তি হ'ল, এরা টাকা বা ধান ঋণ দিয়ে ফসল উৎপাদনে সহায়তা করেছে। সুতরাং, এই উপকার বা সহযোগিতার বিনিময়ে কিছু 'পারিতোষিক' তো প্রাপ্য হ'তেই পারে। উল্লেখ্য, জাহিলীয়াতের যুগে আরব ভূখণ্ডে এভাবে খেজুর লগ্নির প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। ফলে দেখা যায়, ফসল তোলার পর নগদ অর্থ বা ফসলের সূদসহ ঋণ পরিশোধের পর কৃষকের হাতে আর তেমন কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। তাকে আবার ঋণ করতে হয় সংসার চালাবার জন্যে। ঋণের এই অশুভ চক্র হ'তে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। ক্রমেই তার ঋণের পরিমাণ বাড়ে। এক সময়ে জমি-জিরাত ভিটেমাটি দখল করে নেয় জমিখেকো মহাজনরা।

কৃষকরা এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা আকস্মিক বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সূদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হ'তে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা বন্ধক রেখে সূদ আসলসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তা না হ'লে কি মহাজন, কি ব্যাংক সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নিবে। নিলামে চড়াবে দেনার দায়ে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে একটা উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক, কোন ব্যাংক হ'তে আলু চাষের জন্য কৃষক ১৬% সূদে টাকা ১০,০০০/= ঋণ নিল। এজন্যে তাকে বছর শেষে বাড়তি টাঃ ১৬০০/= পরিশোধ করতে হবে। তাই ঐ কৃষকের জমিতে অবশ্যই আরও বেশী আলু উৎপন্ন

হওয়া দরকার। আলুর দাম গড়ে টাঃ ৪০০/= মণ হ'লে বাড়তি চার মণ আলু উৎপাদন হওয়া চাই। মজা হ'ল আলুর ফলন বেশী হ'লে তা সবারই ক্ষেতে হবে। ফলে দাম পড়ে যাবে। আলুর দাম যদি মণ প্রতি টাঃ ৪০০/= হ'তে টাঃ ৩৫০/= তে নেমে আসে তাহ'লে চাষীর মণ প্রতি টাঃ ৫০/= অর্থাৎ ঐ আলুতেই তার টাঃ ২০০/= ঘাটতি থেকে যাবে। মোট বিক্রিত আলুতে ঘাটতির পরিমাণ যে আরও বেশী হবে তা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু ঋণের পরিমাণ যত বেশী হবে ঘাটতির পরিমাণও তত বেশী হবে। বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র কী? ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের ২৭% ভূমিহীন ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৭ বছরের মধ্যে এর চিত্র পাল্টে গেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারী হ'তে দেখা যায়, বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা মোট কৃষিনির্ভর পরিবারের ৬৮.৮% এ দাঁড়িয়েছে *(সূত্র : স্ট্যাটিস্টিকাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ ১৯৯৬, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, পৃ. ১৭৯)*।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর হ'তেই এদেশে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকদের অব্যাহতভাবে ঋণ দেওয়া শুরু করে। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা প্রদান রহিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে তাঁর নির্দেশে দেওয়া একশ কোটি টাকার আই.আই.সি.পি. ঋণ দেওয়া হয়, যার প্রায় সবটাই আজও অনাদায়ী রয়ে গেছে। এরপরও বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা মুতাবিক তখন পর্যন্ত কৃষকদের কাছে প্রাপ্য পাঁচ হাযার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করা হয়েছিল। এরপরেও কেন দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে? এর অন্যতম প্রধান কারণ সূদভিত্তিক ঋণ প্রদান বা গ্রহণ। শুধু এদেশেই নয়, যে সমস্ত দেশে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক কৌশলগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি অথবা মূল্য সহায়তা (price support) বা উপাদান ভর্তুকী (input subsidy) আকারে বিশেষ সরকারী সহায়তা দেওয়া হয়নি সেসব দেশে সূদনির্ভর লেনদেনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে।

১০। **সূদের ফলে একচেটিয়া কারবারের প্রসার ঘটে :**

বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হ'তে ঋণ পেতে পারে ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় অসম

সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরো বড় হয়। ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, বিনিয়োগ কোম্পানী ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সূদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো প্রকট হয়।

১১। সূদের কারণে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই পুঁজি আবর্তিত হয় :

সূদ আদায় ও প্রদানের সামর্থ্যের কারণেই বিত্তবান ঋণদাতা ও গ্রহীতাদের হাতেই পুঁজি আবর্তিত হ'তে ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ কোম্পানী তথা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান এবং ধনিক শ্রেণীর মধ্যে একটা অদৃশ্য সেতুবন্ধন বা যোগসাজশ লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে, অবৈধভাবে বা অন্য কোন উপায়ে কেউ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে সূদের বদৌলতেই সে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে পারে। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত জামানত দিতে না পারার কারণে স্বল্পবিত্তদের এখানে কোন ঠাঁই নেই। ফলে বিত্তশালীরা একাধারে সমাজকে শোষণ করে এবং একচেটিয়া কারবারেরও প্রসার ঘটে। সমাজে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক নানা বিপর্যয়। এজন্যেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে বলেছেন, كَيْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ 'সম্পদ যেন কেবলমাত্র (তোমাদের) ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়' *(হাশর ৫৯/৭)*।

১২। সূদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ :

সূদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সূদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশীবার সূদ যুক্ত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের

প্রয়োজনে তুলা আমদানী করতে হয়। আমদানীকারকরা ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় বিদেশ থেকে তুলা আমদানীর জন্য তার সূদ যুক্ত হয় ঐ তুলার বিক্রয় মূল্যের উপর। এরপর সুতা তৈরীর মিল ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় তারও সূদ যুক্ত হয় ঐ তুলা থেকে তৈরী সুতার উপর। পুনরায় ঐ সুতা হ'তে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল সংস্থা বা কোম্পানী যে ঋণ নেয় সেই সূদ যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের এজেন্ট বা ডিলার তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হ'তে যে ঋণ নেয় তারও সূদ যোগ করে দেয় ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের উপর। এভাবে চারটি স্তর বা পর্যায়ে সূদের অর্থ যুক্ত হয়ে বাজারে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দাম দিয়ে থাকে।

একটা নমুনা হিসাবের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হ'ল। ধরা যাক, বিদেশ হ'তে তুলা আমদানীর জন্যে কোন ব্যবসায়ী ব্যাংক হ'তে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিল। এরপর বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে তা থেকে তৈরী কাপড় বাজারে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত সূদজনিত মূল্য বৃদ্ধির চিত্রটি কেমন দাঁড়াবে? সঠিক অবস্থা বোঝার জন্যে দুটো অনুমিতি (Assumption) এখানে ধরা হয়েছে : (ক) উৎপাদন, বিপণন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক হ'তে ঋণ নেওয়া হয়েছে, এবং (খ) সূদের হার সকল ক্ষেত্রেই ১৬%। এই উদাহরণে বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় (যেমন- জাহাজ ভাড়া, কুলি খরচ, বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যয়, গুদাম ভাড়া, পরিবহন ব্যয়, শ্রমিকের বেতন/মজুরী, সরকারী কর/শুল্ক ইত্যাদি) হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

উদাহরণ-২

ক. আমদানীকারীর আমদানীকৃত তুলার ক্রয়মূল্য টা: ১,০০,০০০/= হ'লে তার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,১৬,০০০/=।

খ. সুতা তৈরীর মিলের তুলার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,১৬,০০০/= হ'লে সুতার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাকা: ১,৩৪,৫৬০/=।

গ. কাপড় তৈরীর মিলের সুতার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৩৪,৫৬০/= হ'লে কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,৫৬,০৮৯/=।

ঘ. মিল হ'তে এজেন্ট/ডিলারের কাপড়ের ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৫৬,০৮৯/= হ'লে কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,৮১,০৬৪/=।

Contents

ঙ. এজেন্ট/ডিলারের কাছ থেকে পাইকারী বিক্রেতার কাপড়ের ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৮১,০৬৪/= হ'লে তার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ২,১০,৬৪/=।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যে তুলার ক্রয়মূল্য ছিল টাঃ ১,০০,০০০/= সেই তুলা হ'তে তৈরী কাপড় ভোক্তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে সূদ বাবদেই মূল্যের সাথে অতিরিক্ত টাঃ ১,১০,০৩৪/= যুক্ত হয়েছে, যা ভোক্তাকেই দিতে হবে। কারণ চূড়ান্ত বিচারে শেষ অবধি প্রকৃত ভোক্তাই মোট সূদের ভার বহন করে। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে সূদ দিতে না হ'লে অর্থাৎ সূদ উচ্ছেদ হ'লে এই অতিরিক্ত বিপুল অর্থ (টাকা পিছু অতিরিক্ত ১.১০ টাকা) ভোক্তাকে দিতে হ'ত না।

এভাবে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূদ জড়িয়ে আছে। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সূদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ সূদভিত্তিক অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সূদ না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি চালু থাকলে এই যুলুম হ'তে জনসাধারণ রেহাই পেত। এতে শুধু তাদের জীবন যাত্রার ব্যয়ই কম হ'ত না, জীবন যাপনের মান হ'ত আরো উন্নত।

১৩। **সূদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক :**

সূদের হার উচ্চ থাকলে বিনিয়োগ থাকে ন্যূনতম কোঠায়। তখন শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষে মুনাফা অর্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে সময়ে মজুরী বৃদ্ধি মানেই লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া। সূদী-অর্থনীতিতে সূদের হার খুব কম থাকলে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বেশী হ'তে পারে কিন্তু পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় না। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে শ্রমিকের চাহিদাও কম থাকে। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান অনেক বেশী থাকায় শ্রমিকদের দিক থেকে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন আদৌ সহজ হয় না। উপরন্তু বিদ্যমান কম মজুরীতেই চাহিদার চেয়ে শ্রমিকের যোগান বেশী হওয়ায় উদ্যোক্তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবী সহজে মেনে নিতে চায় না। ফলে অনিবার্যভাবেই সংঘাত দেখা দেয়। শ্রমিকরা কর্মবিরতি, ঘেরাও, ধীরে চলো, ধর্মঘট, হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচীর আশ্রয় নেয়। পরিণামে মালিক পক্ষ ছাঁটাই, লেঅফ, লক আউট ইত্যাদি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে, সূদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে বিক্রিও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মজুরী বৃদ্ধি পেলে মুনাফার হার হ্রাস

পেয়ে সূদের হারের চেয়েও নিচে নেমে যেতে পারে। তাই মজুরী বৃদ্ধির কোন দাবীই শিল্প মালিকদের পক্ষে বিবেচনায় আনা সম্ভব হয় না।

এই কারণেই জাপানে মেইজী শাসন আমলে মজুরী বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের জোর দাবী থাকলেও যাইবাৎসু গোষ্ঠী তা মেনে নেয়নি, সরকারও এ ব্যাপারে শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। বৃটেনেও কৃষকদের স্বার্থে প্রণীত ১৮১৫ সালের শস্য আইন (Corn Law) ত্রিশ বছর পরেই বাতিল করা হয় শিল্পপতিদের স্বার্থে। শস্য আইন বহাল থাকলে গমের দাম বৃদ্ধি পেতো। এতে কৃষকেরা লাভবান হ'ত। কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করাও অপরিহার্য হয়ে পড়তো যার ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে শিল্পপতিদের মুনাফা হ্রাস পেতো। ফলে তাদের স্বার্থহানি ঘটতো। তাই তারা আন্দোলন করেছিল ঐ আইন বাতিল করার জন্যে।

১৪। **সূদ দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে :**

সূদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ধরনের বিনিয়োগে আদৌ উৎসাহ দেখায় না। এজন্যেই ব্যয়বহুল বড় শিল্প-কারখানা সূদী ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠতে পারে না। এসব শিল্প-কারখানা স্থাপনে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তা সূদের ভিত্তিতে যোগান দিলে প্রতি বছর বিপুল অংকের অর্থ সূদ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। বড় বড় মিল-কারখানা সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে চালু হ'তে দুই হ'তে তিন বছরের gestation period প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে সূদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এমন অংক দাঁড়াবে যে সে বোঝা বহন করা লাভজনক শিল্পের পক্ষেও সম্ভব নয়। আর লোকসান হ'লে সূদে-আসলে ঋণের যে অংক দাঁড়ায় তা পরিশোধ করা কখনো সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তা তখন দেউলিয়া হ'তে বাধ্য হয়। একমাত্র মতলববাজ ঋণখেলাপীরাই তথ্যবিকৃতি ঘটিয়ে ব্যাংক হ'তে বড় আকারের বিনিয়োগ গ্রহণ করে শিল্প বা কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্যে। কারখানা গড়ে তুললেও তারা আর কখনও ঋণ পরিশোধ করে না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। এর অশুভ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের অর্থনীতি।

১৫। **সূদ সঞ্চয়কে অনুৎপাদনশীল সরকারী বিনিয়োগে উৎসাহিত করে :**

সূদী অর্থনীতির ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকাররা ঝুঁকিমুক্ত, নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণের গচ্ছিত আমানতের বিরাট এক অংশ

ট্রেজারী বিল ক্রয়, বিনিময় বিল ভাঙানো, সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্র ক্রয় ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দেয়। পরিণামে সূদের হার বৃদ্ধি পায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা আরো হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। যুগপৎ কর্মসংস্থানের সংকোচন হয় ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় সংকটের। এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সরকারকেই এগিয়ে আসতে হয় সংকট মোচনের জন্যে।

১৬। **সূদের কারণে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃহ্রাস পেতে থাকে :**

পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, সূদের কারণেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় অবশ্যম্ভাবীভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে। উপরন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণও সূদ। এই দুইয়ের যোগফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। নির্দিষ্ট আয়ের শ্রমজীবী, সাধারণ কৃষিজীবী, নানা ধরনের পেশাজীবী ও বেতনভুক্ত কর্মচারীরা এই সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল। এদের আয়ের স্তর ও পরিমাণ যেহেতু মোটামুটি একটা দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম থাকে সেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে একদিকে জীবন যাপনের মানের অবনতি ঘটে, অন্যদিকে বাজারে কার্যকর চাহিদারও সংকোচন ঘটে। এরই চূড়ান্ত পরিণাম হিসাবে কলকারখানায় মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় শিল্প-উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা তখন কমে যায় আরও এক ধাপ।

১৭। **সূদভিত্তিক ঋণে তৈরী প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হ'লে উদ্যোক্তা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে :**

উদ্যোক্তা যতক্ষণ ব্যাংকের সূদ পরিশোধ করে ততক্ষণ ব্যাংক তার ঋণ মঞ্জুরী অব্যাহত রাখে। এমনকি ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। কিন্তু যখনই কারবারে লোকসান দেখা দেয়, তখন ব্যাংক নতুন অর্থলগ্নি করা দূরে থাক পূর্বের ঋণ ফেরত দেবার জন্যেই চাপ দেয়। এই অবস্থায় উদ্যোক্তা মাথায় হাত দেয়। কারণ তার নিজের পুঁজি ছিল সামান্যই, পুরো ব্যাপারটিই ছিল

পরের ধনে পোদ্দারী। ফলে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিণামে গোটা কারবারটি বন্ধ বা ধ্বংস হয়ে যায়।

১৮। সূদভিত্তিক ঋণের কারণে ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপে সমগ্র জাতির ঘাড়ে :

বাংলাদেশ এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। ধনী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা নির্দিষ্ট হারে সূদ প্রদানের অঙ্গীকারে তাদের দেওয়া Collateral বা জামানতের বিপরীতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হ'তে দশগুণ বা তারও বেশী পরিমাণ ঋণ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ নিজেদের দশ লক্ষ টাকা থাকলে তারা এক কোটি টাকা ঋণ পায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব বা সম্পৃক্ততাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোটি টাকারও বেশী এই অর্থের ব্যবসা বা শিল্পে যে মুনাফা হয় তার সবটুকুই ভোগ করে ঐ ঋণগ্রহণকারী উদ্যোক্তা। ব্যাংকে অর্থ আমানতকারীরা সূদ পেলেও মুনাফার কোন অংশই তারা পায় না। অথচ লোকসানের কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হ'লে তার দায়ভার চাপে গোটা জাতির উপর। জনগণের সঞ্চয় তখন আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার দৃশ্যমান লোকসান ঐ দশ লক্ষ টাকা হ'লেও (যদিও পূর্বের মুনাফা সে পুরোটা একাই ভোগ করেছে) জনসাধারণের লোকসান অনেক ক্ষেত্রে পুরো কোটি টাকাই। কষ্ট করে এই টাকা যারা সঞ্চয় করে ব্যাংকে আমানত রেখেছিল তাদেরই এখন ফতুর হবার পালা।

বাংলাদেশের ঋণখেলাপী শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেও ব্যাংক হ'তে তাদের গৃহীত ঋণ শোধ হবার নয়। কারণ এর পেছনে অদৃশ্য হাতের কারসাজি কাজ করেছে। রাজনৈতিক মদদে ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্যরাই নামে-বেনামে ঋণ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশের কোন তোয়াক্কা না করেই। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকল্প সমীক্ষাও করা হয়নি। শুধুমাত্র সূদের হিসাব কষেই কল্পিত মুনাফার লোভনীয় টোপ দিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে হাযার হাযার কোটি টাকা, যা আর কোন দিনই ব্যাংকে ফিরে আসবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলো সরকারী তহবিলের মদদ পেলেও বেসরকারী ব্যাংকগুলো এই দায় উদ্ধারের জন্য কার মদদ পাবে?

১৯। সূদ অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার মুখ্য কারণ :

একথা সর্বজনবিদিত যে পুঁজি বাজারে মূলধনের চাহিদা হ্রাস পেলে সূদের হার হ্রাস পায়, আবার মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সূদের হারও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের সূদের হারের ওঠানামা কালীন সারির তথ্য (Time series data) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কোন দেশে সূদের হার দীর্ঘকাল স্থিতিশীল থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন কারণে তেজীভাব শুরু হ'লে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পুঁজির যোগানদার তখন সূদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে পুঁজির চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূর্বের চেয়েও হ্রাস পায়। এর মুকাবিলায় সূদের হার আবারও হ্রাস করা হয়। পুনরায় মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সূদের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এভাবে সূদের হারের ঘন ঘন ওঠানামার কারণে বিনিয়োগকারীরা নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরই ফলে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রা বাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এর বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে সাম্প্রতিক সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে। বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়, বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান। শেষ অবধি সরকারকে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের সহযোগিতা 'প্যাকেজ' মঞ্জুর করতে হয়। তবু সেই মন্দার ধকল এখনও সামলে উঠতে পারেনি মার্কিন অর্থনীতি।

২০। সূদের দীর্ঘমেয়াদী কুফলস্বরূপ অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয় :

সূদভিত্তিক বিনিয়োগ ও ব্যবসার কারণে অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হ'তে থাকে। এর ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। যে কোন অর্থনীতির জন্যে এ অবস্থা অনাকাঙ্খিত। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সূদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সূদের হার যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণ গ্রহীতারা হিসাব করে যদি দেখে যে অতিরিক্ত সূদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা কম, তখন তারা ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন পুঁজি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয়, ব্যবসায়ে সৃষ্টি হয় মন্দা। এভাবে পুঁজির চাহিদা কমে গেলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশায় ব্যাংক সূদের হার কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন করে ঋণ

নিয়ে তখন উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। ক্রমে মন্দা কেটে গিয়ে পুনরায় তেজীভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে বারবার মন্দা ও তেজী অবস্থার সৃষ্টি অর্থনীতির জন্যে যে অত্যন্ত অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতির জন্ম দেয় সে বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারাও একমত।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সূদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সূদ আসলেই অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য নয়, সঞ্চয়ের জন্যে তো নয়ই। বরং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সূদনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ লর্ড জন মেনার্ড কেইন্‌স তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The General Theory of Employment, Interest and Money*-তে প্রমাণ করেছেন সঞ্চয়ে সূদের কোন ভূমিকা নেই। সূদ বিদ্যমান না থাকলেও লোকে ব্যক্তিগত কারণেই অর্থ সঞ্চয় করবে। দুর্দিনের খরচ ও আকস্মিক বড় ধরনের ব্যয় মেটাবার প্রয়োজনেই তারা সঞ্চয় করে।

২১। সূদ ধন বণ্টনে অসমতার অন্যতম কারণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক :

কেইন্‌স দেখিয়েছেন সূদের জন্যেই বরং বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। যে কোন দেশের অর্থনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সূদের উচ্চ হারের সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াস সংকুচিত হয়েছে। অপরদিকে সূদের হার যখন ন্যূনতম তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসও বেড়ে গেছে। কেইনসের মতে সূদের হার যখন শূন্য, তখনই পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জনের লক্ষ্য পূরণ হয়। বাংলাদেশের শিল্পকারখানার সাম্প্রতিক অবস্থার প্রতি নজর দিলে এই সত্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য। দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং রপ্তানী আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস গার্মেন্টস ও নীটওয়্যার শিল্পের কারখানা মালিকেরা সমস্বরে দাবী তুলেছে বিদ্যমান সূদের হার হ্রাস করার জন্যে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান সূদের হার ১৬%-১৮% হ'তে হ্রাস করে ন্যূনতম ৫% বা তার নিচে নামিয়ে আনা না হ'লে তাদের লোকসান দিতে হবে, এমনকি কারখানা বন্ধ করে দিতে হ'তে পারে। অন্যান্য শিল্প-কারখানা মালিকেরাও অনুরূপ দাবী তুলেছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক বাধ্য হয়েই বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান সূদের

হারকে যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। *(দ্রষ্টব্য: দৈনিক সংগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮)*। কারণ শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে শুধু বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনই বন্ধ হবে না, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকও বেকার হবে, সরকার হারাবে বিপুল রাজস্ব। সমগ্র অর্থনীতিতে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অনিবার্যভাবেই। একই সঙ্গে ব্যাংকেও অলস টাকার পাহাড় জমবে। তাছাড়া ধনবণ্টন, বিশেষতঃ মুনাফা ও মজুরীর ক্ষেত্রে সূদের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে এবং বিত্তশালীদেরই সূদের ভিত্তিতে বৃহৎ আকারের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগের ফলে অনিবার্যভাবেই ধনবণ্টনে অসমতা সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য, সূদ শুধু অর্থনৈতিক সাম্যেরই বিরোধী নয়, সামাজিক সম্প্রীতিরও বিরোধী।

২২। **সূদ মুদ্রাস্ফীতিতে প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগায় :**

অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ সূদ। সূদনির্ভর অর্থনীতিতে সূদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি যুক্ত হ'লে দ্রব্যমূল্য হয় আরও ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পায় না। ফলে জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সূদনির্ভর অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আমানতের বিপরীতে বহুগুণিতক ঋণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিক হারে উপার্জনের আশায় অর্থাৎ সূদ প্রাপ্তির জন্যে বিপুল পরিমাণে কাগুজে আমানতসৃষ্ট ঋণ দেয়। এক্ষেত্রে বাস্তবে অর্থ না থাকলেও ঋণ গ্রহীতার ক্রয়ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়, যার প্রতিফলন ঘটে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্যের ক্ষেত্রে। পরিণামে অবধারিতভাবেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

উপরন্তু সূদী ব্যাংক গ্যারান্টির ভিত্তিতে অনেক অনুৎপাদনশীল ঋণ, ভোগ্যঋণ ও সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। এসব ঋণের সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির কোন সংগতি থাকে না। অর্থাৎ, বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়ে কিন্তু তার বিপরীতে পণ্যসামগ্রী ও সেবার যোগান বাড়ে না। ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয় মুদ্রাস্ফীতির, যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোন পদক্ষেপই ফলপ্রসূ বা কার্যকর বিবেচিত হয় না। অথচ এই সময়ে ব্যবসায়ীরা বর্ধিত মূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেয়। ব্যাংকের পক্ষেও বেশী পরিমাণে সূদ

আদায়ের সুবিধা হয়। কিন্তু জনগণের, বিশেষতঃ সীমিত আয়ের লোকদের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাদের জীবন যাপনের মানের অধোগতি হ'তে শুরু করে যা রোধ করা সহজে সম্ভব হয় না। শেষ অবধি জনতার অব্যাহত জোর দাবীর মুখে সরকার যখন সচেতন হয় কিছু একটা করার জন্যে, ততদিনে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে যায়।

২৩। **সূদ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প স্বনির্ভর হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক :**

দারিদ্র্য বিমোচন তথা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান বা মাইক্রো ক্রেডিটের ব্যবহার ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই উদ্যোগ প্রকৃত লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ হ'তে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ প্রায়শঃই প্রান্তিক। সেই প্রান্তিক মুনাফাও শূন্য বা ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়ায় সূদ পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতার ফলে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্যে ঋণ নিয়ে সূদসহ মূলধন পরিশোধ করার সময়ে দেখা যায় কঠোর শ্রমের দ্বারা উপার্জিত বর্ধিত আয়ের প্রায় সবটুকুই তুলে দিতে হচ্ছে ঋণদাতা এনজিওর মাঠকর্মীদের হাতে। ফলে ঋণগ্রহীতার হাতে মুনাফা হিসাবে প্রায় কিছুই থাকছে না। অর্থাৎ লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে নিচ্ছে। এজন্যেই উদ্যোক্তার নিজের পুঁজি গড়ে উঠে না। নিজ হ'তেই উদ্যোগ গ্রহণ তার পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় প্রায় অসম্ভব। এই সত্যই ফুটে উঠেছে মার্চ ২০১০-এ অনুষ্ঠিত পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (PKSF) সেমিনারে। আলোচকদের মতে সূদের হার ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে না আনলে স্বনির্ভরতা অর্জনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

নিজের পুঁজি গড়ে না উঠলে মূলধনের জন্য পরনির্ভরশীলতা থেকেই যায়। তাকে পুঁজিপতির বা অর্থলগ্নিকারীর শরণাপন্ন হ'তেই হয়। এই সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকে ক্ষুদ্র ঋণদাতারা তথা এনজিওগুলো। এরা কখনই আন্তরিকভাবে চায় না যে, ঋণগ্রহীতারা প্রকৃতই স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। তাহ'লে সূদ উপার্জনের উর্বর ক্ষেত্রগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। এজন্যেই এরা লাভ-লোকসানের অংশীদারীভিত্তিক বিনিয়োগ নয়, সূদভিত্তিক ঋণ দিতেই অধিক আগ্রহী। বস্তুতঃ দারিদ্র্য বিমোচন নয়, এরা প্রকারান্তরে দারিদ্র্যের চাষ করছে।

গ. রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল

২৪। সূদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায় :

উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রায়শঃ শিল্প ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঐসব ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সূদসহ পরিশোধযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায়ই দেখা যায় ঐসব ঋণ না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যায়, না উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে কাঙ্খিত উন্নতি অর্জন করা যায়। ফলে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, অনেক সময় শুধু সূদ শোধ দেওয়াই দায় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্য এসব দেশ আবার নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে। এই নতুন ঋণ সূদে-আসলে পূর্বের ঋণকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সূদ-আসলে সমুদয় ঋণই বোঝা হয়ে চাপে জনগণের কাঁধে।

অনুরূপভাবে দেশে কোন বিপর্যয় বা সংকট দেখা দিলে অথবা খাদ্যশস্যের মতো অপরিহার্য পণ্যের ঘাটতি ঘটলে তা পূরণের জন্য সরকারকে বন্ধু দেশ বা ঋণদানকারী কনসর্টিয়াম থেকে ঋণ নিতে হয়। ভোগের জন্যে গৃহীত এই ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোন উৎপাদন বা কর্মসংস্থান হয় না, সেহেতু এই ঋণের আসল পরিশোধ তো দূরের কথা, যথাসময়ে সূদই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সরকারকে হয় বাড়তি কর আরোপ করে এই অর্থ জনগণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়, নয়তো আবারও ঋণ নিতে হয়।

২৫। সূদের কারণেই ধনী ও দরিদ্র দেশের প্রকৃত সম্পর্ক হয় শোষক-শোষিতের :

বর্তমান বিশ্বের দেশগুলোকে প্রধানতঃ দু’টি অভিধায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে- ধনী ও দরিদ্র খুব সম্মান রেখে বললে বলা হয় উন্নত ও উন্নয়নশীল। দরিদ্র দেশগুলো সকলেই প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র নয়। তাদের রয়েছে পর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু এই দুই সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য তাদের যেমন নেই আধুনিক প্রযুক্তি তেমনি নেই পর্যাপ্ত অর্থ। এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে ধনী দেশগুলো। পৃথকভাবে কোন

একটি দেশ নয়, বরং ইউরোপের ধনী দেশগুলোর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ার ধনী দেশগুলোর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক জোটবদ্ধভাবে প্রাকৃতিক সম্পদশালী কিন্তু আপাতঃ দরিদ্র দেশগুলোকে তাদের হাতের মুঠোয় রাখতে বদ্ধপরিকর। সেজন্যে এদের কৌশলের অন্ত নেই। এদের প্রধান কাজ হ'ল বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশাল বিশাল প্রকল্প তৈরী ও গ্রহণ করিয়ে আর্থিক সহযোগিতার নামে চড়া সূদে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণে প্ররোচিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে শোষণ করা। ছলে-বলে-কৌশলে তারা এই কাজটা অব্যাহতভাবে করে চলেছে।

একবার ঋণের ফাঁদ এসব দেশের গলায় পরাতে পারলে তাদের মতলব হাসিল হয়ে যায়। তখন যেমন রাজনৈতিকভাবে এদেরকে চাপে রাখা যায়, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে এসব দেশকে শোষণের পথও সুগম হয়ে যায়। এই শোষণ যেমন দীর্ঘমেয়াদী তেমনি এর প্রকৃতিও ভয়াবহ। শুধু গৃহীত ঋণের সূদ বাবদ তখন প্রতি বছর হাযার কোটি টাকার উপর পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশ গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সূদ বাবদই পরিশোধ করেছে বাংলাদেশী মুদ্রায় **১৩১১** কোটি টাকা। *(সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৯; পৃ. ২৫১, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)*। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠান যেমন রাজনৈতিক দল, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সংবাদপত্র, পার্লামেন্ট এমনকি ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলোও ক্রমেই ঋণদাতা দেশগুলোর কর্তৃত্বের আওতায় চলে আসে। পুঁজিপতিরা যেভাবে চায় সে ধরনের সরকারই এসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সরকারের যাবতীয় পলিসিও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এরাই কৌশলপত্র তৈরীর নির্দেশ দেয় এবং সেই কৌশলপত্রও (Poverty Reduction Strategy Paper) এদের তত্ত্বাবধানেই তৈরী হয়, যার গূঢ় উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন নয়; বরং দারিদ্র্যের প্রসার, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের আরও বেশী পরমুখাপেক্ষী করে তোলা।

উন্নত ধনী দেশগুলোর সাথে দরিদ্র দেশগুলোর বৈষম্য যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সূদী ঋণ ব্যবস্থা। সূদভিত্তিক বৈদেশিক ঋণ দুনিয়ার দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলোর সূদভিত্তিক ঋণ আজ আন্তর্জাতিক শোষণের

মুখ্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যা সাম্রাজ্যবাদেরই আরেক নতুন রূপ। এরই কারণে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এ সম্পর্কে এখন কার্যতঃ শোষক ও শোষিতের।

পরিত্রাণের উপায়

সূদের এই সর্বগ্রাসী সয়লাব, এর বিধ্বংসী কুফলসমূহ হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় কি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ নয়শত বছরে মুসলিম বিশ্বে কোথাও সূদ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের পতনদশা শুরু হ'লে যখন পাশ্চাত্যের ধনবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহ একে একে মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করতে শুরু করে তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় চরম নাজুক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূ-সম্পত্তি সবই চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলে। এই সময়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সূদের বিস্তার শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে যখন এসব দেশ পুনরায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। সূদ উচ্ছেদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রচেষ্টাও চলেনি। অর্থবহ কোন জোরদার কর্মসূচীও গৃহীত হয়নি। সূদ উচ্ছেদের জন্য মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামী পদ্ধতির ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশের মত বহু মুসলিম দেশে সূদ অর্থনৈতিক-সামাজিক ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে দাপটের সাথে বিরাজমান। কিভাবে একে সমাজদেহ হ'তে উচ্ছেদ করা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ'তে কিভাবে চিরতরে দূর করা যায়, এক কথায় সূদ বর্জনের কৌশল কি হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে এখানে বাস্তবধর্মী কিছু কর্মসূচী আলোচিত হ'ল।-

সামাজিক কর্মসূচী

১. গণসচেতনতা সৃষ্টি :

সূদ বর্জনের তথা সমাজ হ'তে সূদ উচ্ছেদের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। এদেশের জনগণের প্রায় ৮৫% লোক মুসলমান। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু যথার্থ ইসলামী জ্ঞানের অভাবে সূদ যে সর্বৈব হারাম সে সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত নয়। কেউ কেউ বলেন, ঐ নির্দেশ চৌদ্দশত বছর আগে ঠিক ছিল,

এখন নয় (নাঊযুবিল্লাহ)। তাদের যুক্তি, ব্যাংকের সূদ ও ব্যক্তির দাবীকৃত সূদ একই পর্যায়ের বিবেচিত হ'তে পারে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভবই হয়নি। আবার একদল বলেন, আরবী 'রিবা' এবং ইংরেজী Interest একই অর্থ বহন করে না। অথচ আভিধানিক ও ব্যবহারিক বিচারে রিবার অর্থ এবং ইংরেজী Interest-এর ব্যবহারিক অর্থ একই দাঁড়ায়। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ, ২৭৫)*। দেশের সাধারণ জনগণের বিপুল অংশ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের এই নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। এজন্যই তাদের কাছে এই ইলাহী নির্দেশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা অতীব যরূরী। সূদের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে প্রথমেই যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার তা হ'ল সূদের আয় যেমন হারাম, সূদের সঙ্গে যেকোন ধরনের সংশ্লিষ্টতাও তেমনি হারাম এবং হারাম উপায়ে উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ– 'তোমাদের মধ্যে যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয় তাদের সকলের উপর আল্লাহ্র লা'নত'।[১৩]

ছহীহ হাদীছ অনুসারে আল্লাহ্র কাছে দো'আ কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে তার অন্যতম হ'ল হালাল রূযীর উপর বহাল থাকা।[১৪] সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি আমাদের উপার্জনই হালাল না হয় তাহ'লে আল্লাহ্র দরবারে যতই ফরিয়াদ করি না কেন তা কবুল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের সকল ইবাদত বন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল আখিরাতে আল্লাহ্র আযাব হ'তে রেহাই না পাওয়া। তাই ঈমান বজায় রাখার স্বার্থেই আমাদের হালাল রূযী অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যা হারাম তা পরিত্যাগে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মুমিন জীবনের যথার্থ সাফল্য। এই সাফল্য অর্জনের জন্য চাই নিরন্তর প্রয়াস।

---

১৩. *মুসলিম, হা/১৫৯৮; তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/২৮০৭।*
১৪. *মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*

ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল সূদ উচ্ছেদের লক্ষ্য অর্জিত হ'তে পারে। জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। তাই সূদ উচ্ছেদের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য সবার আগে চাই গণসচেতনতা। আমাদের দেশের জনগণের একটা অংশ এখনও শিক্ষিত নয়। তাই কাজটা একটু কঠিন ও আয়াসসাধ্য, তবে অসম্ভব নয়। কারণ এদেশের জনগণ ধর্মভীরু। তাদের যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবী কি এবং তা অর্জনের উপায় কি এটা বুঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহ'লে এদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় সূদ বর্জন সময়সাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। এজন্য কতকগুলি উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমত : মসজিদে জুম'আর খুৎবার সাহায্য গ্রহণ। বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুম'আর ছালাতে শামিল হন। এই ছালাতের খুৎবায় নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি খতীব বা ইমাম ছাহেব সূদী অর্থনীতির কুফল এবং তা দেশ ও জাতির জন্য কতখানি ক্ষতিকর তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন তাহ'লে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়ত : দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ায মাহফিল ও ইসলামী জালসায় ওলামায়ে কেরামগণ বক্তৃতা করে থাকেন। সেখানে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণময় দিক এবং সূদী অর্থনীতির কুফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহ'লে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার ধাক্কাতেই সূদী অর্থনীতি উৎখাত হ'তে পারে, বাস্তবায়িত হ'তে পারে ইসলামী অর্থনীতি।

তৃতীয়ত : দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং। সূদের অপকার সম্বন্ধে আমজনতাকে ওয়াকিফহাল তথা সচেতন করে তুলতে হ'লে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং একটা মোক্ষম উপায়। এর মাধ্যমে সহজেই সূদের ভয়াবহ কুফল ও হালাল রূযীর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে মোটা দাগে প্রয়োজনীয় কথাগুলো সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা যায়। সুন্দর ডিজাইনে বড় বড় হরফে ছাপা পোস্টার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। একইভাবে দেওয়াল লিখনের চমৎকার শ্লোগানগুলো দাগ কেটে বসবে লোকের মনে।

পৃথিবীর সকল দেশেই বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও খোদ সরকারই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। ফলও পাচ্ছে হাতে হাতে।

চতুর্থত : রেডিও-টিভিতে নাটিকা, কথিকা ও আলোচনা অনুষ্ঠান ও টকশো প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে টেলিভিশনের প্রভাব বিপুল হ'লেও রেডিওর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়নি। বিশেষত: নদী, খাল, বিল পরিবেষ্টিত ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত পল্লী বাংলায় রেডিও এখনও বিপুলভাবে সমাদৃত গণমাধ্যম। তাই সূদের শোষণ ও নানাবিধ কুফল সম্পর্কেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'তে পারে রেডিও এবং টিভি থেকে। বাংলাদেশে এখন অনেক বেসরকারী রেডিও ও টিভি চ্যানেল রয়েছে। ইসলামী আদর্শ অনুসারী অনেক প্রোগ্রামও প্রচারিত হয় এসব গণমাধ্যম হ'তে। সেসব প্রোগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ ধরনের অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে অগণিত দর্শক-শ্রোতার কাছে উপভোগ্যভাবে হারাম উপার্জন ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। সূদের অপকার সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হ'তে পারে। টকশোর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রাঞ্জলভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করলে অজস্র মানুষ এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারতো, উপকৃত হ'তে পারতো। তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হ'ত। পরিণামে সূদ পরিত্যাগের জন্য তাদের অনেকেই যে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিতো নিঃসন্দেহে সে আশা করা যায়।

পঞ্চমত : পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় সূদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতাবিধ্বংসী প্রসঙ্গসমূহ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হ'তে থাকলে তা যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে তেমনি গণজাগরণেরও আবহ তৈরী হবে। একই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, দেশের কর্ণধারদের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হ'তে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাকের *'রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ'* এই ধরনের ভূমিকাই রেখেছিল। দেশে এখন ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব দৈনিক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলে তা হবে প্রশংসনীয় এক বিরাট খিদমত।

২. আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করা :

মুসলমানদের জীবনে রয়েছে দু'টি পর্ব- ইহকাল ও পরকাল বা আখেরাত। পরকালের জীবনটাই অনন্ত। ইহকালের জীবন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। পরকালের জীবনে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার অথবা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ নির্দেশিত পথে ইহকালে জীবন যাপন করলে যেমন আখেরাতে রয়েছে আনন্দময় জীবন, তেমনি সেই নির্দেশের পরিপন্থী জীবন যাপনের জন্য রয়েছে অনন্ত দুঃখভোগ। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, خَالِدِيْنَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'অনন্তকাল জাহান্নামে সেই দুঃখভোগ চলতে থাকবে এবং জাহান্নাম নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতম স্থান' *(তাগাবুন ১০)*। যেসব কারণে আখেরাতে বনী আদমকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হ'তে হবে, তার অন্যতম হ'ল হারাম পন্থায় উপার্জন ও হারাম বস্তু ভোগ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّىَ بِالْحَرَامِ، 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত'।[১৫] হারাম খাদ্য শুধু হারাম বস্তু হ'তেই তৈরী হয় না, হারাম উপার্জন হ'তে সংগৃহীত খাদ্যও হারাম বলেই গণ্য হবে।

সূদ-ঘুষ, চুরি-দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, জালিয়াতি, ওযনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, জুয়া, ফটকাবাজারী, প্রতারণা প্রভৃতি সবই ইসলামে হারাম। এসব হারাম পন্থায় উপার্জন করা বা বিত্তবান হওয়া যেমন হারাম তেমনি ঐ উপার্জন বা বিত্ত-সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করাও হারাম। পূর্বেই বলা হয়েছে হালাল রূযী দো'আ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হারাম উপার্জন আখেরাতে আমাদের কোন কাজে তো আসবেই না, উল্টো এর পরিণামফল হবে ভয়াবহ। এজন্যই অন্যান্য সব হারাম উপার্জনের মতো সূদও অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সূদ খাওয়ার পাশাপাশি সূদের হিসাব লিখে ও সাক্ষ্য দিয়েও উপার্জন করা সম্ভব। এই পথও বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ, কোন প্রকারেই সূদের সাথে কোনরূপ সংস্রব রাখা চলবে না। তা না হ'লে এই আয়ের জন্য, এই আয়ে জীবন ধারণের জন্য আখেরাতে ভয়াবহ ও ভীতিকর শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। জনগণের মধ্যে এই চেতনা, এই বোধ জাগিয়ে তোলা অতীব যরূরী।

---

১৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৬০৯।

এ দেশের আমজনতার মধ্যে ইসলামপ্রীতি ঈর্ষণীয়। কিন্তু এদের বিপুল অংশই ইসলামের মূল দাবী *আমর বিল মারূফ* ও *নাহী আনিল মুনকারের* অনুসরণের মাধ্যমেই যে আল্লাহ্‌র ইবাদত বা তাঁর বন্দেগী হয়, সে সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন অজস্র লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস শুধু এগুলো পালন করলেই একজন মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃত হবে এবং আখেরাতে নাজাত পেয়ে যাবে। আয়-রোযগার, ব্যয়, ভোগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি সে সম্বন্ধে না তারা জানার চেষ্টা করেছে, না সেসব আমলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হ'ল অত্যাবশ্যক কাজ।

হালাল রূযী উপার্জনের ব্যাপারে, হালাল খাদ্য ও হালাল সামগ্রী ভোগের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, এমনকি ইমামগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন সে খবর আমরা কতজন রাখি? অথচ সেইসব উদাহরণই হওয়া উচিৎ ছিল আমাদের পালনীয় আদর্শ। বহু লোক আখেরাতকে ভয় করলেও আখেরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে হয় অনবহিত, নয়তো গাফেল বা অসতর্ক। বর্তমানের প্রয়োজনের অজুহাতে অথবা শয়তানের কৌশলী প্রতারণা বা প্ররোচণার বশীভূত হয়ে তারা দুনিয়া তথা এর সম্পদ ও ভোগবিলাস অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। ফলে হালাল-হারামের বাছ-বিচার তার কাছে গৌণ বা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রান্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, সূদের কারবার করে, সূদের লেনদেন করে, সূদী উপার্জনের অর্থেই এই উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় যে, হজ্জের কারণে আল্লাহ তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দিবেন। অথচ ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ এর বিপরীত।

৩. পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা :

বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের তথা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, এ দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আক্বীদার কোন সংশ্রব নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোন পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ

জীবন ব্যবস্থা তা জানার কোন সুযোগই নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে। এজন্য প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচীর সংস্কার। যারা আগামী দিনে এদেশের প্রশাসন, বিচার, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে, তাদের যদি এখনই সূদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায়, তাহ'লে জাতি যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

কিশোর বয়সেই যা শেখা যায়, যে বিষয়গুলো স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সারা জীবন তার প্রভাব রয়ে যায় মানুষের চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারার উপর কখনো সচেতনভাবে কখনো অবচেতন মনে। সেজন্যই বিভিন্ন মতাদর্শের স্কুলের পাঠ্যসূচীর বিষয় নির্বাচন করা হয় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে, প্রচুর যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ভাবনার পর। সরকার পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহের পাঠ্যক্রমে জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, কল্যাণময় জীবন, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্য যেসব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য সেসব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর স্কুল পাঠ্যসূচী বা যেসব সিলেবাস অনুসরণ করা হয় সেগুলি একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আমাদের দেশেও বিগত দশকগুলিতে স্কুলের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। দেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনগাঁথা, বৃক্ষরোপণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক কালে এইডসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে স্কুলের পাঠ্যসূচীতে।

অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়, ইসলামী জীবনাদর্শ, আচরণ, ইসলামী শিক্ষা, অমর মুসলিম মনীষীদের জীবনকাহিনী এই পাঠ্যসূচীতে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু, কিশোর-কিশোরীর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট হয়ে গড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিকড়হীন জনসমর্থনহীন বাকসর্বস্ব মুষ্টিমেয় এইসব বুদ্ধিজীবীর সুকৌশলী পদক্ষেপ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে যেন কোনক্রমেই ইসলামী জীবনাচরণ সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ না

থাকে সেজন্য এরা প্রায়শই সেক্যুলার পাঠ্যসূচীর যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠ্যসূচীর অপরিহার্যতা ইত্যাকার চটকদার ব্যানারে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-ওয়ার্কশপের আয়োজন করে গৃহীত সুপারিশসমূহ জাতীয় দাবী শিরোনামে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পেশ করে। একই সঙ্গে তাদের ঘরানার পত্রিকাগুলোও জোর সমর্থন দিয়ে যায়। ফলে সরকারের নীতি নির্ধারকরাও বিভ্রান্ত বা বিচলিত না হয়ে পারে না।

অথচ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ ছিল। ইসলামী জীবনাচরণ, হালাল উপার্জনের অপরিহার্যতা, যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল, সূদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রসঙ্গ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা খুবই যরূরী।

৪. সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি :

সূদের মতো ভয়াবহ এক অক্টোপাসের নাগপাশ হ'তে মুক্তি লাভ করতে প্রয়োজন মযবূত সামাজিক প্রতিরোধ। যথাযথ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে বহু অন্যায়-অপকর্ম ও অসামাজিক কাজ হ'তে জনগণকে বিরত রাখা যায়। জনগণকে সত্যিকার উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সামাজিকভাবে সচেতন করতে পারলে বহু কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এদেশে বনায়ন কর্মসূচী তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বছর ত্রিশেক পূর্বে দেশের অনেক এলাকায় মরুকরণের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সেই সময়ে বৃক্ষরোপণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনমত তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়। রেডিও-টেলিভিশন সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে নানা অনুষ্ঠান প্রচার ছাড়াও স্কুল-কলেজ মক্তব-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এই কাজে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গৃহীত হয়। একাজের সামাজিক স্বীকৃতি স্বরূপ শহর, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজ তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

সূদ উচ্ছেদের জন্য এ ধরনের জনমত গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক সময়ে এদেশের সমাজে সূদবিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজ সমাজে সূদখোরদের দাপট চোখে পড়ার মতো। গ্রামাঞ্চলে সূদখোররা মহাজন নামে পরিচিত। সূদী ব্যবসার কারণে সমাজপতিদের মধ্যেও তারা আসন করে নিয়েছে। শহরেও সূদের লেনদেনকারী ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা সকল কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সূদকে আজ আর ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। এর প্রতিবিধানের চেষ্টা না করলে এই সর্বনাশা পাপ ও সমাজবিধ্বংসী বিষ আরও ভয়াবহ রূপ নিবে। এজন্যেই প্রয়োজন

সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সূদের নিষ্পেষণ ততই আলগা হ'তে বাধ্য। ক্রমে এক সময়ে তা খসে পড়বে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল-

ক. সূদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা : সমাজে যারা সূদখোর বলে পরিচিত, ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে, সূদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গ বর্জন করছে বা তাদের এড়িয়ে চলছে। কাজটা কঠিন মনে হ'তে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

খ. সূদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো : জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোন কাজে সূদখোরদের নির্বাচিত হ'তে দেওয়া হবে না। তারা ভোটপ্রার্থী হ'লে যেন ভোট না দেওয়া হয় সেজন্য জোর প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে এইসব লোকের কার্যক্রমের জন্যই সমাজে শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকবে।

গ. সূদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা : যারা সূদের ব্যবসা করে, গ্রামে মহাজনী কারবারের (গ্রামাঞ্চলে সূদী ব্যবসার প্রচলিত নাম) সাথে যারা যুক্ত তাদের ছেলে-মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলে-মেয়ে বিয়ে না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়ানোও উত্তম প্রতিষেধকের কাজ হ'তে পারে। বাংলাদেশেই আজ হ'তে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সূদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইত না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দ্বীনী শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে সেই অবস্থার দুঃখজনক পরিবর্তন ঘটেছে।

ঘ. ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা : সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সূদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার উপর সূদ দিতে হয়। সূদের বদলে সরকার জরিমানা আরোপ করতে পারে। ঈমান ও আক্বীদাবিরোধী সূদ কেন দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেন খাজনার খাত থেকে সূদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা চালু করে সে লক্ষ্যে জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

উপরে উল্লিখিত কাজগুলো কঠিন নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুমিনের জীবনে কোন্ কাজটি সহজ? বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সমবেতভাবে এসব উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে।

৫. অনাবশ্যক সামাজিক ব্যয় প্রতিরোধ :

সমাজে বসবাস করতে হ'লে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন যোগ দিতে হয় তেমনি আয়োজনও করতে হয়। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন ঐ সব অনুষ্ঠান আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু অনেক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে চালু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐসব অনুষ্ঠানের কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই। যেমন কেউ মারা গেলে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনের মাথায় ধুমধাম করে দশগ্রামের বা মহল্লার লোকজন ডেকে খানাপিনার আয়োজন করা। ছেলের খাৎনা উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব, পড়শী-স্বজন সকলকে ডেকে উৎসবমুখর পরিবেশ ও ভোজের আয়োজন এবং অভ্যাগতদেরকে উপঢৌকন প্রদানে বাধ্য করা। এছাড়াও রয়েছে জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি নানা বিদ'আতী অনুষ্ঠান। রয়েছে বিচার আচার ও শালিশী বৈঠক। এসব বৈঠকের জন্য যে প্রচুর ব্যয় হয় তা বলাই বাহুল্য। বিয়ে-শাদীর কথা তো না বলাই ভাল। ইসলামের এই অপরিহার্য ও সরল সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণে ঢুকে পড়েছে পান-চিনি বা পাত্র দেখা, গায়ে হলুদ, বিয়ের তত্ত্ব পাঠানো এবং রয়েছে ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা। সম্প্রতি যৌতুকবিরোধী মনোভাব দানা বেধে ওঠার প্রেক্ষিতে একে গিফট বা উপঢৌকনের লেবাস পরানো হয়েছে।

একজন বিত্তশালী ব্যক্তি অক্লেশে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে নতুন বিত্তশালী বা হঠাৎ করে ধনী হওয়া লোকেরা সামাজিক পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভের জন্য তাদের অর্জিত নতুন বিত্ত খরচ করেন অকাতরে। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলা হয় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কাউকে। সমাজপতিরা রায় দেন- এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এটা দিতে হবে। না হ'লে সমাজচ্যুত হ'তে হবে। অথচ এসবের ব্যয়ভার বহনের সাধ্য তার নেই। নিরুপায় হয়ে তখন তাকে সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হয় অথবা ঋণ নিতে হয় সূদ দেবার শর্তে। সাধারণতঃ এসব সামাজিক

প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের সূদের হার বেশ চড়া হয়ে থাকে। কারণ ঋণদাতা ভাল করেই জানে যে, ঋণ গ্রহীতার বিকল্প কোন উপায় নেই। সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বাধ্য হয়ে নেওয়া এই ঋণ অতি অবশ্যই অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতের। ফলে তা পরিশোধ করা হয়ে দাঁড়ায় আরও দুরূহ। তাই ঋণের বোঝা চেপে বসে গ্রহীতার মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো। শেষ অবধি তাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু, এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত বেচে দিতে হয় ঋণ পরিশোধের জন্য। এই পথে গ্রাম বাংলার হাযার হাযার মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হয়েছে। চাকুরীজীবিদের অনেকের ক্ষেত্রে এই ব্যয় পুষিয়ে নেবার অন্যতম উপায় ঘুষ, যার বোঝা বইতে হয় পরোক্ষভাবে সমাজের সকলকেই। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্য চাই ব্যাপক গণসচেতনতা।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী

১. শরী‘আহ ভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের প্রসার :

আধুনিক সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা রাখতে হ’লে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রচলিত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সূদনির্ভর বিধায় শরী‘আতের সাথে সাংঘর্ষিক। এরই প্রতিবিধানের জন্য গত চার দশক ধরে মুসলিম বিশ্বে গড়ে উঠেছে ইসলামী শরী‘আহ ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু সেগুলি পুরোপুরি শরী‘আহ ভিত্তিক করা সম্ভব নয় বলে অভিজ্ঞমহলের বিশ্বাস। এর সবচেয়ে বড় কারণ হ’ল এই যে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হ’ল সূদভিত্তিক এবং একই সঙ্গে পুঁজিবাদী। তাই ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের যেমন রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা, তেমনি রয়েছে নানা আইনী প্রতিবন্ধকতা।

২. করযে হাসানাহ ও মুযারাবা পদ্ধতির বাস্তবায়ন :

সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে করযে হাসানাহ ও মুযারাবা পদ্ধতি। ইসলামী অর্থনীতির এই অপরিহার্য বিধান দু’টি এদেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি সংখ্যালঘু মুসলমানের দেশ শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানাহ প্রদান ও সোসাইটিভিত্তিক মুযারাবা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ দেশেও এই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। সমাজের

বিত্তশালী লোকদের করযে হাসানাহ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্যোগ যদি মসজিদকেন্দ্রিক হয় তাহ'লে সত্যিকার যোগ্য লোককে যেমন সুযোগ দেওয়া যাবে, তেমনি এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

মুযারাবা পদ্ধতি এদেশে চালু করতে সময়ের প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন হবে আইন কাঠামো বদলানোর পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের লোক সৃষ্টি। উত্তম ও যোগ্য লোকেরা মুযারাবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি উভয়বিধ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু সমাজের বিত্তশালী লোকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন তাদের ইসলামী অনুশাসন জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। এর ফলে দুঃসময়ে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া সহজ হবে বিনা সূদেই এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা সূদ প্রদানের বাড়তি দায় হ'তে রক্ষা পাবে। করযে হাসানাহ দিলে সেই অর্থের জন্য আয়কর দিতে হবে না এবং মুযারাবার ক্ষেত্রে ছাহেবুল মাল বা সম্পদের মালিককে কেবল মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বের জন্য আয়কর দিতে হবে এমন আইন করে বিত্তশালী মুসলিমদের মনোযোগ এ ক্ষেত্রে আকর্ষণ করা সম্ভব।

৩. যাকাতভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ :

সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্র হ'তে সূদ নির্মূল করতে হলে যাকাতভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইসলামের অন্যতম মুখ্য কৌশল। এই কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের যেমন বিকল্প নেই তেমনি এর সাথে আপোষও হ'তে পারে না। মুসলিম সমাজে যেদিন হ'তে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও তার যথাযথ ব্যবহার বন্ধ হয়েছে সেদিন হ'তেই দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা তথা যুল্ম চেপে বসেছে। বিশেষতঃ যেসব কারণে লোকেরা সূদভিত্তিক ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। সেসবের মূলোচ্ছেদ করতে হ'লে যাকাতের জুড়ি নেই। যাকাতের অর্থ গ্রহীতার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় বা তার জন্যে ব্যয় করা হয় কোন প্রত্যুপকার বা আর্থিক প্রত্যাশা না করেই। তাই এক্ষেত্রে লাভের গুড় পিঁপড়ের খাওয়ার কোন আশংকা নেই।

যাকাতের অর্থ উৎপাদনী ও অনুৎপাদনী উভয় ধরনের প্রয়োজন পূরণে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর এবং আকস্মিক বিপদগ্রস্ত লোকের প্রয়োজনের প্রধান ও বৃহৎ অংশটিই অনুৎপাদনী শ্রেণীর।

মুখ্যতঃ এই প্রয়োজন পূরণের জন্যই তারা মহাজনের শরণাপন্ন হয় এবং গৃহীত অর্থের জন্য সূদ প্রদানে বাধ্য থাকে। অথচ যাকাতের অর্থের জন্য তো অনুৎপাদনী বা উৎপাদনী যে কাজেই ব্যবহার করা হোক না কেন- সূদ তো দিতে হবেই না, মুনাফা হ'লেও তার অংশবিশেষও কাউকে দিতে হবে না। যাকাতভিত্তিক মূলধন ফেরত দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই এই অর্থ ব্যবহার করে যথার্থ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা যতটা সহজ মাইক্রো ক্রেডিটের দ্বারা তা আশা করা যায় না।

উল্লেখ্য, সমাজের যে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মজীবী হ'লে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিধারা সচল হয়, কেইনসের ভাষায় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছানো যায় সেই স্তরে পৌঁছুতে হ'লে প্রয়োজন একটা Big Push বা প্রবল ধাক্কা। এজন্যে যুগপৎ প্রয়োজন বিপুল অর্থের ও দক্ষ উদ্যোক্তার। উদ্যোক্তা উন্নয়ন তথা ভিখারীর হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে রূপান্তরের মধ্য দিয়েই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম। এজন্য প্রয়োজন মানবসম্পদ উন্নয়ন। দারিদ্র্য বিমোচনের পদক্ষেপের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গৃহীত না হ'লে সমাজে স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন অসম্ভব। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তর তথা মানবসম্পদে উন্নীত করার জন্য অন্ন-বস্ত্র ছাড়াও যেসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণ খুবই যরূরী সেসবের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা এবং গৃহায়ন। সূদনির্ভর ঋণভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ হবার নয়। অথচ পরিকল্পিতভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে এই লক্ষ্য অর্জন খুবই সম্ভব।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা ২০০৫-এ বৃদ্ধি পেয়ে ৫ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে *(বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০৭; পৃ. ১৪৮)*। এদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার গ্রহণ করেছেন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (Poverty Reduction Strategy Paper বা PRSP) আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরীর কর্মসূচী। দুঃখের বিষয়, এজন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এর চাইতে বহু গুণ অর্থ আদায় হ'তে পারে যাকাত সূত্রেই, যদি সরকার এজন্যে প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক

প্রতিবেদন এবং কৃষিবিভাগের ফসল উৎপাদনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমাদের মতো দেশেও যাকাত ও উশর সূত্রে বার্ষিক চার হাযার কোটি টাকার বেশী অর্থ আদায় হওয়া খুবই সম্ভব। উপরন্তু PRSP-এর আওতায় সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বেশ কিছু যরূরী পদক্ষেপ বাদ পড়েছে যেগুলো গ্রামীণ জনগণ ছাড়াও শহর ও শহরতলীর জনগণের জন্যও সমানভাবে প্রয়োজন। এসবের মধ্যে রয়েছে সহায়-সম্বলহীন বিধবা এবং বিকলাঙ্গদের জন্য জীবনধারণ উপযোগী মাসোহারা, কন্যাদায়গ্রস্তদের কন্যার বিবাহে আর্থিক সহযোগিতা, প্রসবকালীন অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণ, দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি যোগান, ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণ, মরণোত্তর ঋণ পরিশোধ, দরিদ্র পরিবারের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ, স্বল্পব্যয়ে বাসগৃহ নির্মাণ এবং নদীভাঙ্গন ও অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন। তাছাড়া প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মহীন সময়ে যাকাতের অর্থ হ'তে পরিকল্পিতভাবে সহায়তা প্রদান করলে সূদভিত্তিক ঋণের চাহিদা দূর হবে।

৪. ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন :

দরিদ্র অথচ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য পুঁজির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই পুঁজির পরিমাণও যে খুব বেশী এমন নয়। কিন্তু তাই-ই তাদের কাছে সহজলভ্য নয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসাবে 'মাইক্রো ক্রেডিট' বা ক্ষুদ্রঋণের প্রসার ঘটেছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় জাতীয়-আঞ্চলিক মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক এনজিও এই কাজে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

মাইক্রো ক্রেডিট মাকড়সার জালের মতো সমগ্র দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু দরিদ্র জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা যারা ক্ষুদ্র ঋণের সর্ববৃহৎ ক্লায়েন্ট, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কি সত্যি সত্যি দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে? দু'চারটি সম্মানজনক ব্যতিক্রমী ঘটনাকে উদাহরণ হিসাবে দেখানো যায় কিন্তু সেসবের ভিত্তিতে সরলীকরণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে বিপত্তি ঘটে। ঋণ ও সূদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট হারে সূদসহ কিস্তি প্রদানের শর্তেই এনজিওরা ঋণ দিয়ে থাকে। পুঁজি পাওয়ার কোন সহজ উপায় না থাকায় নিরুপায় হয়ে দরিদ্র মহিলা ও পুরুষরা ঋণ নেয়। এই ঋণের সূদের হার যথেষ্টই চড়া।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য পরিচালিত কয়েকটি মাঠ গবেষণা তথ্য হ'তে দেখা গেছে, এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ ব্যবহার করে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য যেটুকু হ্রাস পেয়েছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাদের স্বনির্ভরতা অর্জন বা নীট দারিদ্র্য হ্রাস ঘটেনি। এর প্রধান কারণ, প্রাপ্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে ঋণগ্রহীতারা যা উপার্জন করে তার বৃহৎ অংশই চলে যায় সূদ পরিশোধ করতে। ফলে তাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে যৎসামান্যই। তাদের অপেক্ষায় থাকতে হয় পুনরায় ঋণ পাবার জন্য। পুনরায় ঋণ না পেলে তার কর্মসংস্থানের উপায়টিও বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া সূদসহ মূলধনের কিস্তি শোধ করতে গিয়ে বহু সময়েই দারুণ বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির শিকার হ'তে হয় ঋণগ্রহীতাকে। সূদভিত্তিক এনজিওর মাঠকর্মীরা খাতকের ঘরের চালের টিন খুলে নিয়েছে, শেষ সম্বল দুধের গরু ধরে নিয়ে গেছে, এমনকি ন্যূনতম সভ্যতার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে সধবার নাকফুল পর্যন্ত খুলে দিতে বাধ্য করেছে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য এমন ঘটনা অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলিতে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয়।

এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণের জন্য বিকল্প ইসলামী পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার করতে হবে। মাইক্রো ক্রেডিটের পরিবর্তে মাইক্রো ইনভেষ্টমেন্টের ব্যাপক প্রসার ঘটানো এখন সময়ের দাবী। উদ্যোগ নিতে হবে ঋণ নয়, বিনিয়োগ প্রদানের জন্য। এই উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ স্কীম বা Participatory Investment Scheme চালু করা বাঞ্ছনীয়। এটি মুযারাবা পদ্ধতিরই একটি রূপ। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হ'তে অর্জিত মুনাফার একটা অংশ পাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও, বাকীটা পাবে উদ্যোক্তা। লাভ যদি না হয় তাহ'লে উদ্যোক্তাকে কোন বাড়তি দায় নিতে হবে না। এক্ষেত্রে যেহেতু পূর্বনির্ধারিত হারে সূদ পরিশোধের শর্ত নেই, সেহেতু লাভ না হ'লেও বাধ্যতামূলকভাবে সূদ প্রদানের দায়িত্বও নেই। কাজেই কষ্টার্জিত উপার্জনের সিংহভাগ তুলে দিতে হবে না এনজিওদের হাতে। প্রকৃত অর্থে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহীতারাই উপকৃত হবে এই পদ্ধতিতে। পাইলট স্কীম হিসাবে হ'লেও এই পদ্ধতি চালু করা সময়ের দাবী। তৃণমূল পর্যায় হ'তে সূদ উচ্ছেদের জন্য এটি কার্যকর কৌশল হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে।

৫. আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় পরিহার :

বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার পথ ধরে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে নিয়মিত উপার্জনে ব্যয় সংকুলান না হ'লে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়। এই মোক্ষম সুযোগে সূদ অনুপ্রবেশ করে সংসারে, সাধ্যের বাইরে যেয়ে বিলাসবহুল বাড়ী বানাতে হ'লে, ফ্যাশানেবল গাড়ী কিনতে হ'লে, কেতাদুরস্ত লাইফস্টাইল অনুসরণ করতে হ'লে ঋণ না করে উপায় নেই। বিকল্প উপায় দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ-উপার্জন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋণ ও সূদ অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। তাই ঋণ পেতে হ'লে সূদ দেবার অঙ্গীকার করতেই হয়। উপরন্তু বর্তমান সময়ে কিস্তিতে যেসব গৃহসামগ্রী ও ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিক দ্রব্যসামগ্রী বাজারে দেদারসে বিক্রি হয় সেসবেও যুক্ত রয়েছে সূদ। তাই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন হ'তে সূদ উচ্ছেদ করতে হ'লে অতি অবশ্যই বিলাসিতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অন্যের অন্ধ অনুসরণ এবং আড়ম্বরপ্রিয়তা পরিহার করা যৌক্তিক দাবী।

উপসংহার

আশা করা যায়, উপরে আলোচিত উপায়সমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এদেশে সূদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব। এর ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস সূচিত হবে। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানসিকতা প্রবলভাবে ইসলামমুখী। পক্ষান্তরে বিদ্যমান আইন-কাঠামো, সামাজিক আচরণ, এমনকি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই চিন্তা-চেতনা ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে সমাজে বিরাজমান রয়েছে এক বিষম অবস্থা।

আজও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও রোমান-বৃটিশ আইন দ্বারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রিত। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, সূদ বর্জন ও উচ্ছেদের জন্য যেমন একদিকে চাই ঈমানের জোর ও সূদের নানামুখী ধ্বংসাত্মক কুফল সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি চাই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। সূদ উচ্ছেদ ও বর্জনের কৌশল হিসাবে যেসব উপায়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলিই শেষ কথা নয়, আরও উপযুক্ত পথ বা কৌশল উদ্ভাবিত হ'তে পারে। কিন্তু কাগজের পাতাতেই এসব কৌশল আবদ্ধ থাকলে কোন

সুফল আসবে না। বরং বাস্তবায়নযোগ্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান রচনা করে সেই অনুযায়ী ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেলে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্তিরও আশা করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের সময় মুসলিম বিশ্বের কোথাও সূদ চালু ছিল না। সেই সময়েও মুসলিম ব্যবসায়ীরা বিশাল মাপের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। সুদূর চীনের জিনজিয়াং এলাকা হ'তে স্পেনের আন্দালুসিয়া, কর্ডোভা কিংবা আফ্রিকার জাঞ্জিবার পর্যন্ত বাণিজ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করেছে, পণ্যদ্রব্যের পসরা নিয়ে বসেছে নগরে-বন্দরে। কিভাবে সে সময়ে তাদের মূলধনের প্রয়োজন পূরণ হতো? কিভাবে তারা শারী'আর শর্ত পালন করে ব্যবসায়িক লেনদেন করতো?

এর উত্তর হ'ল সেই সময়ে তারা মুযারাবা, মুশারাকা, বায়য়ে সালাম, বায়য়ে মুয়াজ্জাল, মুরাবাহা, ইসতিসনা, কেরায়া, জু'আলাহ, ইজারা, ইজারা বিল বায়য়ে, শিরকাতুল মিলক্ ইত্যাদি দশ/বারোটি পদ্ধতি ব্যবহার করতো। ফলে তাদের কখনই সূদের ভিত্তিতে অর্থ লেনদেনের প্রয়োজন হয়নি। আধুনিককালে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব পদ্ধতিই ব্যবহার করে চলেছে তাদের আমানত বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এ কাজে ইতিমধ্যেই তাদের অর্জিত সফলতা রীতিমতো ঈর্ষণীয়।

বস্তুতঃ অর্থনীতি সূদবিহীন হ'লে বিনিয়োগের জন্য যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও সমাজ স্বার্থবিরোধী বিনিয়োগ বন্ধ হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও বড় ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই ইসলাম সূদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হ'লে তার উৎসকেই সমূলে বিনাশ করতে হবে। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ (নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব) *(আছ ছফ ৬১/১৩)*। তবে সেজন্য নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এক অর্থে সূদ উচ্ছেদ একটি জিহাদ। তাই এজন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই সূদের ভয়াবহ

যুলুম হ'তে মানবতা মুক্তি পাবে। হালাল রিযিক প্রাপ্তির মাধ্যমে দো'আ কবুলের বদৌলতে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও ক্ষমা লাভের সুযোগ হবে। একই সাথে ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক সাফল্যও নিশ্চিত হবে।

পাঠসহায়ক বইপত্র

১। মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫)।

২। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, অনুবাদ: আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৪)।

৩। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, সুদমুক্ত অর্থনীতি (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫)।

৪। মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, (ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২)।

৫. Khurshid Ahmad (ed.) Elimination of Riba from the Economy (Islamabad: IPS, 1995).

৬. Abdul Hamid El-Ghazali, Profit Versus Bank Interest in the Economic Analysis and Islamic Law, (Jeddah: IRTI/IDB, 1994).

৭. Government of Pakistan, *Report of the Council of Islamic Ideology on the Elimination of Interest from the Economy* (Islamabad: Council of Islamic Ideology, 1980).

৮. Tariqullah Khan, *Interest-free Alternatives for External Resource Mobilization* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997).

৯. Waqar Masood Khan, *Towards an Interest-free Islamic Economic System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)

১০. Ibrahim Lawson, (ed), *Usuary: The Root Cause of the Injustices of Our Time* (Norwich: People Against Interest Debt, 1989).

১১. Syed Nawab Haider Naqvi, *On Replacing the Institution of Interest in a Dynamic Islamic Economy* (Islamabad: PIDE, 1981).

১২. Pakistan Federal Shariah Court, *Judgement on Interest (Riba)* ed. Khurshid Ahmad (Jeddah: IRTI/IDB, 1995).

১৩. Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1961).

১৪. Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking* (Cambridge: Cambridge University Pess, 1986).

১৫. M. Nejatullah Siddiqi, *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition* (Jeddah: IRTI/IDB, 2003).

মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ঃ প্রসঙ্গ জিজিএন

** {আমাদের অনুরোধে এটি মাসিক 'আত-তাহরীক, রাজশাহী, অক্টোবর ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত মাননীয় লেখকের একটি পৃথক প্রবন্ধ। সেসময়ে দেশে গজিয়ে ওঠা এম, এল, এম. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'জিজিএন' ও 'নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড' সম্পর্কে এটি তাঁর একটি অনবদ্য রচনা। আলোচ্য বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে প্রবন্ধটি সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে এটি সংযুক্ত করা হ'ল। -প্রকাশক}*

সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে 'গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক' (জিজিএন) নামের একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে। জিজিএন এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড' সম্পর্কে প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। *দৈনিক জনকণ্ঠ* (৯, ১২, ১৭, ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০০), *দৈনিক মানবজমিন* (৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০), *দৈনিক ইনকিলাব* (৯ই সেপ্টেম্বর ২০০০), *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ* (১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০) প্রভৃতি পত্রিকায় এদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এদের সম্বন্ধে সন্দেহ ও প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন সূত্র হ'তে এই প্রতিষ্ঠান দু'টি সম্বন্ধে যা জানা গেছে এবং এদের নিজেদের প্রচারিত লিফলেট ও হ্যাণ্ডআউট হ'তে যা উপলব্ধি করা গেছে, তা থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি জোরেশোরে এদেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদের কৌশল এতই 'ফুলপ্রুফ' এবং গাণিতিকভাবে বিশুদ্ধ যে, এরা প্রতারিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাবে।

জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিউওয়ে যে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে একে বলা হয় 'বাইনারি পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে 'ডুপ্লিকেশন অব টু' তত্ত্ব অনুসারে একজন হ'তে দু'জন এই দু'জনের প্রত্যেকেই আবার দু'জন এমনিভাবে চক্রাকারে বা গ্রুপভিত্তিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করেই যেতে থাকে। গাণিতিকভাবেই এই সংখ্যা অসীম হ'তে পারে বা হওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই তারা নেটওয়ার্ক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকান বংশোদ্ভূত বর্তমানে কানাডার নাগরিক মিঃ নবরত্নম শ্রী নারায়ণা থাসার স্বত্বাধিকারীতে প্রতিষ্ঠিত

জিজিএন বাংলাদেশে কাজ শুরু করে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস হ'তে। এদের প্রধান কার্যালয় ঢাকার গুলশান দেখানো হ'লেও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বনানীর একটি বাড়ী থেকে।

নেটওয়ার্ক ব্যবসা কমিশনভিত্তিক হয়ে থাকে। প্রথমে একজন ক্রেতা নির্দিষ্ট একটি অংকের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে, যা পণ্যের আসল মূল্যের চাইতে অনেকগুণ অধিক। শর্ত থাকে যে, এই ক্রেতা কমিশন পাবে। কোম্পানী যে বেশী পরিমাণ অর্থ পূর্বেই আদায় করে রেখেছিল সেই অর্থ হ'তেই এই কমিশন দিয়ে থাকে। প্রথম জন কোম্পানীর এজেন্ট বা পরিবেশক হিসাবে যে দু'জনকে সংগ্রহ করেছিল তাদের প্রত্যেকেই এখন নিজেরা এজেন্ট বা পরিবেশক হিসাবে দু'জন করে নতুন ক্রেতা সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে প্রথম জনের মত এই নতুন দুই এজেন্টও কমিশন পাবার হকদার হবে। এবারে নতুন যে চারজন ক্রেতা হয়েছে তারা নিজেরা এজেন্ট হিসাবে প্রত্যেকে দু'জন করে নতুন ক্রেতা সংগ্রহ করবে। ফলে ঐ চারজন তখন কমিশন পাবে। এভাবেই এজেন্ট ও ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কোথায় গিয়ে এই সংখ্যা থামবে তা কেউ জানে না।

অবশ্য প্রথম ক্রেতাই যদি এজেন্ট হ'তে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ নতুন দু'জন ক্রেতা সংগ্রহ করতে না পারে, তাহ'লে তার কমিশন পাওয়ার আশা নেই। এক্ষেত্রে তার ব্যবসাও যেমন এখানেই শেষ, তেমনি তার প্রদত্ত পুরো টাকাটাই কোম্পানী অবলীলাক্রমে হাতিয়ে নেয়। অথচ সে এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোন আইনানুগ পদক্ষেপই নিতে পারে না। কারণ সে জেনে বুঝেই এই ফাঁদে পা রেখেছিল। সাহিত্যের ভাষায় একেই বলে 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। অনুরূপভাবে প্রথম ক্রেতা এজেন্ট হ'তে পারলেও তার শিকার নতুন দুই ক্রেতা যদি এজেন্ট হ'তে না পারে তাহ'লে তারাও একইভাবে প্রতারিত হবে।

এই নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে এমন একটা সময় আসবে, যখন আর এজেন্ট হওয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ নতুন ক্রেতা পাওয়া যাবে না। তখন প্রান্তিক লোকটি নিশ্চিতভাবেই প্রতারিত হবে এবং এ রকম চূড়ান্তভাবে প্রতারিত লোকের সংখ্যা হবে লক্ষ লক্ষ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই হবে বেকার ও শিক্ষিত যুবক-যুবতী।

জিজিএন ও তার বাংলাদেশী সহযোগী নিউওয়ে (প্রাঃ) লিঃ-এর কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও প্রতারণাগুলো আরও বিশদ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। নীচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।

(১) প্রতিষ্ঠান দু'টি তাদের পণ্যের যে প্যাকেজ বিক্রি করছে তার মোট মূল্য টাকা ৭,৫০০/=। এর মধ্যে তারা টাকা ৩,৫০০/= লাভ করছে বলে নিজেরাই দাবী করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাদের বিক্রিতব্য পণ্যটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন ব্রাণ্ডের নয়। সুতরাং এর প্রকৃত গুণাগুণ ও মূল্য যাচাই করা যেমন অসম্ভব, তেমনি ঐ দ্রব্যটির সুবাদে কোম্পানী কত মুনাফা করছে তাও জানা অসম্ভব। যা হোক যিনি বা যারা চড়া মূল্যের ঐ প্যাকেজটি কিনছেন, তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে চড়ামূল্যে কিনতে স্বীকৃত হওয়ার ফলে এই লেনদেন বা ব্যবসা শরী'আহ্র দৃষ্টিতে জায়েয মনে হ'লেও তিনি প্রকৃতপক্ষে জেনেশুনেই প্রতারিত হচ্ছেন এবং প্রতারিত হয়েও প্যাকেজটি ক্রয় করছেন এই আশাতে যে, তিনি যদি তারই মত আরও দু'জন গ্রাহক বা ক্রেতা ম্যানেজ করতে পারেন তাহ'লে অন্ততঃ তার নিজের দেওয়া অতিরিক্ত ১৮০০/= টাকা ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে।

এটা অনেকটা ঈশপের সেই লেজকাটা শিয়ালের গল্পের মত, যার নিজের লেজ কাটা যাওয়ার পর তার সহযোগী অন্যদেরও লেজ কাটতে প্রলুব্ধ করেছিল। এক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা বা এজেন্ট এবং তার নতুন দুই শিকারের প্রত্যেকেই এই একই প্রতারণাপূর্ণ কাজ আরও দু'জন করে গ্রাহক সৃষ্টির মাধ্যমে সম্প্রসারণের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তারা এটা এজন্যেই করবে যে, এর ফলে প্রথম এজেন্টের প্রথম দুই গ্রাহকের প্রত্যেকেই আবার টাকা ১৮০০/= করে ফেরত পাবে এবং প্রথম এজেন্ট নিজে ফেরত পাবে টাকা ২৪০০/=। মনে রাখা দরকার যে, এদের প্রত্যেকেই প্যাকেজটি কেনার সময় অতিরিক্ত টাকা ৩৫০০/= করে প্রদান করেছিল। সেই অর্থ হ'তেই এই 'মুনাফা' বা 'কমিশন' দেওয়া হচ্ছে। মাছের তেলে মাছ ভাজার এ যেমন এক চমৎকার উদাহরণ তেমনি লোভের টোপ ফেলে চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণারও এক অনন্য নযীর।

(২) কোম্পানী দু'টি টাকা ৭৫০০/= মূল্যের প্যাকেজের পণ্যের মধ্যে সার্ভিস চার্জ, সিকিউরিটি ও বিতরণের জন্য টাকা ৩৫০০/= (৪৩.৬৭%) ধার্য করেছে। অর্থাৎ, মূল পণ্যটির দাম প্যাকেজ মূল্যের ৫৩.৩৩% বা টাকা

৪,০০০/= মাত্র। পরবর্তীতে গ্রাহক/এজেন্ট/পরিবেশক হয়ে গেলে সে এর বিপরীতে টাকা ৬০০/= ফেরত পেতে পারে, যদি নতুন দু'জন গ্রাহক ম্যানেজ করতে পারে। নাহ'লে সে কিছুই ফেরত পাবে না। এক্ষেত্রে পুরো টাকাটাই কোম্পানী হজম করে ফেলবে।

(৩) কোন কোম্পানী পণ্য বিক্রয়ের জন্য সাধারণতঃ সার্ভিস চার্জ দাবী করে না। ক্ষেত্রবিশেষে, বিশেষতঃ যন্ত্রপাতি বসানো ও চালু করার কাজে এ ধরনের চার্জ দাবী করলেও তা মূল্যের ২% হ'তে ২.৫% এর বেশী হয় না। উপরন্তু সার্ভিস চার্জ যদি দাবী করাই হয়, তাহ'লে পণ্য বা সেবা বিতরণের জন্য পুনরায় বিতরণ বা ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ নেবার নিয়ম নেই। অথচ এরা সেই গর্হিত কাজটিই করছে।

(৪) সিকিউরিটি বাবদ গৃহীত অর্থ সব সময়েই মূল ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য কোম্পানী দু'টি মূল ক্রেতাকে ঐ অর্থ বা তার কিয়দংশও ফেরত দিবে না, যদি না তিনি পরবর্তীতে এজেন্ট বা পরিবেশক হ'তে পারেন। এভাবে সিকিউরিটির নামে গৃহীত অর্থ আত্মসাৎ নিঃসন্দেহে যুলুম এবং ক্রেতাকে শোষণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৫) আলোচ্য দু'টি কোম্পানী ষ্টেপ ১-এ লাভ করে টাকা ৩৫০০/=। কিন্তু গ্রাহককে লাভের কোন অংশ ফেরত দেবার বিধি নেই। তবে ঐ গ্রাহক যদি ষ্টেপ ২-এ এজেন্ট বা পরিবেশক হন, তাহ'লে তাকে অবশ্যই তিনটি প্যাকেজ বিক্রি করতে হবে এবং তিনি ঐ তিনটি প্যাকেজ হ'তে প্রতিটির জন্য টাকা ৬০০/= হারে মোট টাকা ১,৮০০/= ফেরত পাবেন। এক্ষেত্রে কোম্পানীর নীট মুনাফা থাকবে টাকা ৮,৭০০/=। নিঃসন্দেহে এটা বড় ধরনের প্রতারণা।

(৬) কোম্পানীর হিসাব অনুসারে ষ্টেপ ১১-তে গ্রাহক পরিবেশককে ৮০% হারে মুনাফা দেবার কথা। অর্থাৎ তাদের দাবী অনুসারে তারা প্যাকেজপিছু মাত্র টাকা ৭০০/= মুনাফা রাখবে। এক্ষেত্রেও তাদের মুনাফার শতকরা হার দাঁড়াচ্ছে ১৭.৫%। অবশ্য এর পূর্বেই তারা বিরাট অংকের মুনাফা করে নিয়েছে। ষ্টেপ ১-এ তারা কাউকে কোন মুনাফা দেয়নি, ষ্টেপ ২-এ মাত্র টাকা ৬০০/= মুনাফা দিয়েছে এবং ষ্টেপ ৩-এ টাকা ১১১৪/= প্রদান করেছে। এই প্রক্রিয়ায় এজেন্ট/পরিবেশকের প্রাপ্য মুনাফার হার তখনই

ক্রমাগত বেশী হ'তে থাকবে যখন একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও তারই আওতায় ক্রেতার সংখ্যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাবে। ধাপ বা ষ্টেপ যত কম হবে কোম্পানীর মুনাফা তত বেশী হবে। ধাপ বাড়াতে পারলে তবেই ব্যক্তির/এজেন্টের/পরিবেশকের মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

(৭) কোম্পানীর ঘোষিত নীতি অনুসারে কোন এজেন্ট/পরিবেশক একাধারে ৫১১ জন গ্রাহক তৈরী করতে পারলে তবেই ৭৩.৪০% হারে মুনাফা দাবী করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও স্বাক্ষরে এটা হ'তে হবে। কোন একজন গ্রাহকও কোন স্টেপ ধাপ ডিঙিয়ে যেতে বা সিঁড়ি ভাঙতে পারবে না। সেক্ষেত্রে চ্যানেল বা যোগসূত্রের পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে ঐ প্রথম পরিবেশকের উন্নতি বিঘ্নিত হবে এবং বর্ধিত হারে মুনাফা বা কমিশন প্রাপ্তিও বন্ধ হয়ে যাবে।

(৮) প্যাকেজের মাধ্যমে বিক্রিত পণ্যটির গুণ, মান ও প্রকৃত মূল্য জানার কোন উপায় নেই। বিক্রিত দ্রব্য ফেরতও নেওয়া হয় না। বিক্রয়-উত্তর সার্ভিসের সুযোগও নেই। সুতরাং পণ্যটির মেরামত ও সার্ভিসিং-এর কোন সুবিধাই ক্রেতা পাচ্ছে না, যা যেকোন বড় কোম্পানীর ব্যবসার রীতির বরখেলাপ।

(৯) বিক্রিত পণ্যের ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি পত্রের কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ অন্ততঃ এক বা দু'বছরের মধ্যে পণ্যটি ব্যবহারে অযোগ্য বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে তা বদলে নেবার বা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা বা নিশ্চয়তা এই কোম্পানী দু'টি দিচ্ছে না। অথচ বিশ্বব্যাপী খ্যাতনামা কোম্পানীগুলোর এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১০) প্রসঙ্গতঃ আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। বাইনারী পদ্ধতি অনুসারে 'ডুপ্লিকেশন অব টু' রীতিতে অসীম সংখ্যক স্তরের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কোম্পানী দু'টো এরই আশ্রয় নিয়েছে। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে একজন এজেন্ট পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করতে পারে এবং কোম্পানী ঘোষিত বিপুল হারের মুনাফার মালিক হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা প্রায় অসম্ভব। কারণ খুব কম গ্রাহক-এজেন্ট-পরিবেশকের পক্ষে ষ্টেপ ৪-এর নীচে যাওয়া সম্ভব। কারণ চেইনের সূত্র ছিঁড়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশী। এর ফলে কোম্পানীরই বেশী লাভ হবে। একজন ক্রেতা যে

Contents

পরবর্তীতে এজেন্ট বা পরিবেশক হচ্ছে তার ধাপ বা ষ্টেপ যত কম হবে কোম্পানীর মুনাফার পরিমাণও তত বেশী হবে। উদাহরণতঃ ষ্টেপ ৬-এ ৬৩টি প্যাকেজ বিক্রি করলে কোম্পানীর লাভ দেখানো হয়েছে টাকা ২,২০,৫০০/=। এজেন্টের পাওনা টাকা ১,২৩,৬০০/= বাদ দিলে কোম্পানীর নীট লাভ থাকে মোট টাকা ৯৬,৯০০/=। কিন্তু বাস্তবে এই ৬৩ টি প্যাকেজ ৩ স্তরে ৯টি পৃথক চ্যানেলে গ্রাহক/এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করলে কোম্পানীর লাভ হবে টাকা (২৪,৫০০/= টাকা ৭,৮০০/= টাকা) টাঃ ১৬,৭০০×৯= টাকা ১,৫০,৩০০/=। তাই কোম্পানী চাইবে যাতে গ্রাহকের ষ্টেপ কম হয় বা ষ্টেপ-এর সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় যদিও মুখে তারা একথা কখনোই বলবে না।

(১১) আরও একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে অনুধাবনযোগ্য। সেটি হ'ল- পিরামিডের মত এই বিক্রয় কাঠামোর সর্বশেষ স্তরে যারা থাকবে, নিশ্চয়ই তারা পরবর্তী ধাপে গ্রাহক-পরিবেশক হওয়ার আশা নিয়ে পূর্বের গ্রাহক-পরিবেশকের নিকট হ'তে প্যাকেজ কিনবে। এরা সকলেই প্রতারিত হবে যখন আর নতুন ক্রেতা পাওয়া সম্ভব হবে না অথবা কোম্পানীটি হঠাৎ করে পাততাড়ি গুটাবে। যদি দশ হাযার ব্যক্তিও পিরামিডের শীর্ষে থাকে তাহ'লে ষ্টেপ ৯-এ থাকবে (যদি চেইন অবিচ্ছিন্ন থাকে) ৫১,১১,০০০ জন ক্রেতা। যারা মোট ৩,৮৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্যাকেজ কিনবে। এদের কাছ থেকে কোম্পানী মোট মুনাফাই আদায় করবে ১,৭৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে যারা পিরামিডের বাইরে ছিটকে পড়বে তাদের হিসাব পাওয়া হবে অত্যন্ত দুরূহ।

(১২) এই পদ্ধতি সত্যি সত্যি উত্তম ও বিশ্বস্ত হ'লে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে দেশে কারখানা তৈরী করে বা দোকান খুলে ব্যবসা করত না। বরং দেখা যায় অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে লিমিটেড কোম্পানী খুলে তারা পণ্য উৎপাদন করে, সংযোজন করে বা আমদানী করে ব্যবসা করছে। এরাও কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। কিন্তু না জনগণ প্রতারিত হচ্ছে, না তাদের পণ্য ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে জনগণ সন্দিগ্ধ রয়েছে। তারা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে শো-রূমে পশরা সাজিয়ে রেখে খদ্দেরদের যাচাই-বাছাই করার সুযোগ দিয়ে বৈধভাবেই ব্যবসা করছে। উপরন্তু তাদের কোন নেটওয়ার্ক সিষ্টেম নেই।

পক্ষান্তরে জিজিএন পণ্যের বিবরণ ও গুণাগুণ জানাবার পরিবর্তে যেনতেন প্রকারে পণ্যটি ক্রেতার কাছে গছিয়ে দিতেই ব্যস্ত। পণ্যটি অগ্রিম দেখার সুযোগই তারা দেয় না। তারা তাদের ক্রেতাকে আরও দু'জন ক্রেতা কিভাবে ম্যানেজ করা যায়, তারই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে, এরা টাকা নেবার অনেক পরে, ক্ষেত্রবিশেষে তিন মাসেরও পরে মাল দিচ্ছে না। এ ছাড়াও যারা এখন সক্ষম ক্রেতা ম্যানেজ করতে পারছে না, তারা টাকা দেবার পরেও পণ্য ও মুনাফা বা কমিশন কোনটাই পাচ্ছে না। তাদেরকে ক্রেতা সংগ্রহের জন্যই চাপ দেওয়া হচ্ছে। এর থেকে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

(১৩) দুর্ভাগ্য যে, কতিপয় আলেম জিজিএন-র এই যুলুম ও প্রতারণামূলক ব্যবসাকে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাদের সাথে দ্বিমত পোষণের যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। উপরের বিষয়গুলি তাদের বিবেচনার খোরাক হ'তে পারে। বৈধ ব্যবসার জন্য শরী'আতের যেসব শর্ত আরোপিত হয়েছে, সেগুলো আপাতঃদৃষ্টিতে জিজিএন পূরণ করছে বলে প্রতীয়মান হ'তে পারে। কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে অসাধু এবং পরিণাম ফল যে মারাত্মক, তা উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দিলে সহজেই বোঝা যাবে।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে এরা ইতিমধ্যে ৫০ কোটি টাকা হাতিয়ে পাততাড়ি গুটিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এদের ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও কৌশলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এরা আসলেই এদেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে খুবই চাতুর্যের সঙ্গে তাদের ও সেই সাথে দেশের জনগণের পকেট সাফ করে চলেছে।

চাকুরীর খোঁজে উদভ্রান্ত বেকার যুবকদের আড়ম্বরপূর্ণ এয়ারকণ্ডিশন রুমে বসিয়ে ওভারহেড প্রজেক্টের ব্যবহার করে চটকদার সব বক্তব্য দিয়ে আগামী দিনের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে যেভাবে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে, তা নৈতিকতারও পরিপন্থী। পণ্য বিক্রয়ের কৌশল শেখানো, পণ্যের গুণ বা মান এবং সমজাতীয় অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার তুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা আদৌ না বলে কিভাবে তারা তাদেরই মত আরো ক্রেতা জোগাড় করতে

Contents

পারবে, তারই কৌশল শেখানো হয় এসব 'ওরিয়েন্টেশন' ক্লাসে। এজেন্ট হ'তে গেলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ যরূরী। কিন্তু এই কোম্পানীর প্রশিক্ষণের কৌশল ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

(১৪) দৈনিক ইনকিলাবের ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যায় জিজিএন এবং নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ বিজ্ঞাপন ছেপে জানিয়েছে যে, তারা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সকল অনুমতিপত্র গ্রহণ, নিবন্ধীকরণ, সদস্যপদ গ্রহণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেই ব্যবসা করছে। তারা আরও দাবী করছে, তাদের ব্যবসায়ে কোনই গোপনীয়তা নেই। তাদের সকল কাগজপত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত।

এই ঘোষণার কোন দরকার ছিল না। বরং এতে মনে পড়ে যায়, 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনি'। একথা সর্বজন বিদিত যে, কোন দেশে ব্যবসা করতে হ'লে সেদেশের সরকারী ও স্থানীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেই তা করতে হয়। কিন্তু তাতে সততার বা নির্ভরযোগ্যতার গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। যদি আলোচ্য কোম্পানী দু'টো তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে সরকারের যেমন বলার কিছু থাকবে না, তেমনি দেশ ছেড়ে চলে গেলেও পাওনা আদায় করার জন্য কারোরই কোন সুযোগ থাকবে না। কমিশন যদি পণ্য বিক্রয়ের জন্য হয় এবং তাতে যদি কোন ফাঁক-ফোকর রয়ে যায় তাহ'লে চোরাবালিতে পা পড়ার দশা হবে।

(১৫) *দৈনিক ইনকিলাবে* প্রকাশিত ঐ বিজ্ঞাপনেই দাবী করা হয়েছে যে, 'কোয়ালিফাই করার পর কমিশন পাননি এমন একটি উদাহরণও জিজিএন ও নিউওয়ের ইতিহাসে নেই। জিজিএন ও নিউওয়ের বিরুদ্ধে একটি মাত্রও সুনির্দিষ্ট প্রতারণার অভিযোগ বা মামলা নেই'। কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য। জিজিএন ও তার সঙ্গী কোম্পানীটি ক্রেতাদের কমিশন দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, শুরুতেই এই ক্রেতার পকেট কেটে সাফ করেছে তারা। নিম্নমানের পণ্য বাজার দরের চেয়ে বেশী মূল্যে তো বটেই, সেই সাথে আরও অন্যান্য চার্জের নামে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে নিচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, তাকে তারই মত আরও দু'জন ক্রেতাকে শিকার হিসাবে জিজিএন-এর গুহায় ঢুকিয়ে কমিশন পাবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় বা 'কোয়ালিফাই' করতে হয়।

তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ নেই বলে দাবী করা হয়েছে। এর পিছনে দু'টো কারণ রয়েছে। (১) যারা এদের শিকার হয় তারা লোভের বশবর্তী হয়েই এদের পাতা ফাঁদে পা দেয়। সুতরাং তারা কিভাবে প্রতারণার অভিযোগ আনবে? (২) এরা পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে। তখনও কেউ অভিযোগ করে না এজন্যে যে, ইতিমধ্যে আরও যে দু'জন গ্রাহককে সে সংগ্রহ করেছে, তারা এই অভিযোগের কথা শুনলে কেটে পড়বে। ফলে তার সম্ভাব্য কমিশন পাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

(১৬) তারা আরও দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বে এ ধরনের আরও বহু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানী রয়েছে। তাদের এই দাবীর যথার্থতা যাচাইয়ে না গিয়েও বলা যায় যে, প্রতারণা প্রতারণাই। ইসলামে সূদ নিষিদ্ধ। অথচ সূদ পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি। বিশ্বের দু-একটি দেশ বাদ দিলে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সূদভিত্তিক বিনিয়োগ, লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে। তাই বলে কি সূদ হালাল হয়ে যাবে? কোন মুসলমান কি তাকে স্বীকার করে নিয়েছে? নেয়নি। কারণ হারাম যা তা হারামই। সব দেশের সকল মানুষের জন্যেই তা হারাম। এক্ষেত্রেও জিজিএন ও তার সঙ্গী প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ সূদের চাইতেও চক্রবৃদ্ধিহারে লাভ করে ও ক্রেতাকে ঠকিয়ে সেই ধরনের হারাম কাজটিই করছে।

(১৭) জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান শুরু থেকেই তাদের নেটওয়ার্ক ব্যবসা চালাতে 'ম্যানেজ করার' পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে বলে পত্রিকান্তরে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ নবরত্নম শ্রী নারায়ণা থাসা শ্রীলংকার নাগরিক ছিলেন। এদেশে তিনি কানাডার নাগরিক পরিচয় দানকারী একজন বিদেশী। ল্যাণ্ড পারমিট নিয়ে আসার পর ওয়ার্ক পারমিট না থাকা সত্ত্বেও একজন বিদেশীকে কিভাবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হ'ল তা রহস্যজনক। একইভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, সরকারের বিনিয়োগ বোর্ড কিভাবে ল্যাণ্ড পারমিটধারী একজন বিদেশীকে রেজিষ্ট্রেশন দিল? অভিযোগ রয়েছে যে, এসব ম্যানেজ করার পদ্ধতিতেই সম্ভব হয়েছে।

(১৮) যে বিশেষ প্রশ্নটি এখন দেশবাসীর সামনে জ্বলজ্বল করছে সেটি হ'ল- বর্তমান কানাডার এই নাগরিক সেদেশে বা পাশ্চাত্যের কোন দেশে এই ব্যবসা পরিচালনা না করে কেন বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে? এর উত্তরও খুব সহজ। প্রতারণার জন্যে দরিদ্র দেশকে বেছে নিলে বিপদ কম। দরিদ্র

দেশের যুবক-যুবতীরা কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মুনাফার সোনালী হাতছানিতে সহজেই প্রতারিত হয়। এমনকি খোদ সরকারও কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে শুনলে বহু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। উপরন্তু প্রয়োজনে 'ম্যানেজ' করার পথ খোলাই রয়েছে। জিজিএন সেই সুযোগটিই নিয়েছে।

(১৯) এদের লোভের ফাঁদে ইতিমধ্যেই ৩৪ হাযারের বেশী সদস্য পা দিয়েছে। এদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১০২ কোটি টাকারও বেশী বলে *দৈনিক জনকণ্ঠ* (১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০০) জানিয়েছে। মাত্র দেড় বছরের মত স্বল্প সময়ে একশ' কোটি টাকারও বেশী অর্থ সংগ্রহের ব্যবসা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি-না জানা নেই। এদের ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া জটিল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু সরলমনা ক্রেতা তথা এজেন্ট হ'তে অভিলাষীদের অধিকাংশের পক্ষেই এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। বরং পতঙ্গের মত তারা ঝাঁপ দিচ্ছে লোভের অগ্নিকুণ্ডে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, অনেকেই বিষয়-সম্পদ এবং ব্যাংকের সঞ্চিত অর্থ তুলে নিয়ে ছুটছে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসার পিছনে। এক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালের শেষে দেশের শেয়ার মার্কেটে যে ভয়াবহ ধ্বস নেমেছিল তার কথাই মনে পড়ে যায়। সে সময় বছরের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে শেয়ার মার্কেট অদৃশ্য কারোর ইঙ্গিতে দ্রুত চাঙ্গা হ'তে শুরু করে। লোকেরা ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হ'তে শুরু করে বোনেদের-স্ত্রীদের গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। তারপর এক সময়ে মুনাফার ফানুসটি ফেটে যায়। রাতারাতি পথের ফকীর হয়ে দাঁড়ায় অজস্র মানুষ। ঠিক একই রকম অবস্থা পরিদৃষ্ট হচ্ছে এই ব্যবসায়েও।

(২০) প্রসঙ্গতঃ আলবেনিয়ার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। 'পিরামিড স্কীম' নামে পরিচিত এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসা আলবেনিয়ায় ১৯৯৬ সালের শুরু হ'তে সম্প্রসারিত হ'তে থাকে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ছাড়াও বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে উচ্চহারে মুনাফা পাওয়ার আশায় বিপুলভাবে বিনিয়োগ করে এ ব্যবসায়। এমনকি ইতালী ও গ্রীসে কর্মরত আলবেনীয়রাও ব্যাংকে অর্থ না রেখে এ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে থাকে। কোম্পানীগুলো প্রথমে ১৫% হ'তে ২৫% হারে মুনাফা প্রদান করত। ক্রমান্বয়ে মুনাফার এই হার বাড়াতে বাড়াতে তারা ৮০% এ উন্নীত করে। এরপর বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। ফলে

মাত্র কয়েক মাসে ১৬টি কোম্পানী পিরামিড স্কীমের আওতায় ৫ লক্ষাধিক লোকের কাছ থেকে ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার হাতিয়ে নেয়। পরিণতিতে আলবেনিয়ার অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল আজও তার জের কাটেনি।

প্রতারণা ইসলামে হারাম। সেই হারাম সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। জিজিএন গণিতের বাইনারী পদ্ধতির 'ডুপ্লিকেশন অব টু' থিওরী ব্যবহার করে তার প্রতারণাকে যেমন ফুলপ্রুফ পদ্ধতিতে উন্নীত করেছে, তেমনি ব্যবসার মোড়কে এবং কমিশনের মত নির্দোষ পারিতোষিকের ব্যবস্থা রেখে প্রতারণার বহিরঙ্গের চিহ্ন গোপন করতেও সমর্থ হয়েছে। তাই বলে এটা বৈধ হয়ে যায়নি অথবা প্রকৃত ব্যবসাও হয়ে ওঠেনি। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলেই এর অন্তর্নিহিত গলদগুলো ধরা পড়বে। সুতরাং লোভের বশবর্তী হয়ে এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে হারাম উপার্জন ও লোক ঠকানোর মত কবীরা গুনাহে শামিল না হওয়াই শ্রেয়।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এম.এল.এম) সম্পর্কে মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত ফৎওয়া।

প্রশ্নঃ 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয?

উত্তরঃ মৌলিকভাবে দু'টি পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবসা সিদ্ধ। একটির নাম 'মুশারাকাহ' (مـــشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে।[১৬] অপরটির নাম 'মুযারাবাহ' (مضاربة) অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপরজন ব্যবসা করবে। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে।[১৭] প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত সংস্থার প্রকাশিত The Index File, The Concept এবং Sales & Marketing Plan বইসমূহ এবং অন্যান্য উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ ও অর্থনীতি বিভাগের এবং সঊদী আরবের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণের যে লিখিত মতামত আমরা পেয়েছি, তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :

(১) বিধিসম্মত ব্যবসা বলতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে কোন বৈধ পণ্যের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা MLM) ব্যবসায় শুধু লাভের প্রলোভনই দেখানো হয়েছে। কোথাও লোকসানের বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেই। তাই এটা ব্যবসা নাকি লাভের এজেন্সী সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন ও জটিল। (২) এ ব্যবসায় সূদের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি করা না হ'লেও সম্পৃক্ততার বিষয়টি নির্দ্বিধায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। (৩) এতে পিরামিড জুয়ার বিষয়টি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। (৪) সাধারণ কমিশন ব্যবসায়ীরা পণ্য যতটুকু বিক্রি

---

১৬. *আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭০; নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫।*
১৭. *দারাকুৎনী হা/৩০৭৭, মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ।*

হয়, তার উপরে কমিশন পায় এবং অবিক্রিত পণ্য ফেরৎযোগ্য। কিন্তু ডেসটিনির (তথা এম,এল,এম) ব্যবসায়ে এ ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। (৫) ইনডেক্সে বর্ণিত উদ্দেশ্য মতে কোন প্রলোভন না দেখিয়ে নবাগতদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হ'লেও প্রতিটি বক্তব্যের সাথেই প্রলোভনমূলক উপস্থাপনা লক্ষ্যণীয়। (৬) এখানে জুয়ার উপস্থিতি রয়েছে। এটা এমন একটি খেলা যেখানে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে পণ্যকে আশ্রয় করে সদস্য সংগ্রহ করা হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশের বাইরে গ্রাহককে সহজে অর্থ (Easy money) লাভের আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এইসব (এমএলএম) কোম্পানীর পরিবেশিত পণ্যের বাজার মূল্য ধার্যকৃত মূল্যের অর্ধেকেরও কম হবে। এগুলি মানসম্পন্ন হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন ৭৫০০/= টাকার প্যাকেজে (১ম গ্রুপে) তাদের দেওয়া তথ্যমতে পণ্যের মূল্য ৩৫০০/=, সার্ভিস চার্জ ১০০০/=, সিকিউরিটি ১৫০০/=, ডিস্ট্রিবিউশন ১৫০০/= মোট ৭৫০০/=। অর্থাৎ, ৩৫০০/= টাকার পণ্যে ৪০০০/= টাকা বিভিন্ন নাম দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে। এর একটা অংশ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হচ্ছে।

মার্চ ২০০৮-এ 'ডেসটিনি' প্রকাশিত সেল্স এন্ড মার্কেটিং প্ল্যানে (পৃঃ ৭) বলা হয়েছে যে, তাদের মোট বিপণন লভ্যাংশ বণ্টন পরিমাণ প্রায় ৮৮ শতাংশ। অতঃপর ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১২টি ধাপের পর্যায় অর্জিত হবার পর প্রথম ক্রেতা-পরিবেশককে যদি পরবর্তীকালে কোম্পানী থেকে প্রতিটি ভোক্তার ক্রয়কৃত পণ্য-সামগ্রীর উপর (ধরা যাক মাসিক ক্রয় ১০০ টাকা) লভ্যাংশ স্বরূপ বা সাপ্তাহিক কমিশন বাবদ শতকরা ৫ ভাগ হারেও দেয়া যায়, তাহ'লেও সপ্তাহে ন্যূনতম তাকে ৮,০০০/= টাকা কমিশন দিতে হবে'। এইভাবে বিরাট লাভের অংক দেখিয়ে এরা মানুষকে টেনে নিচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় 'গারার' বা প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করেছেন।[১৮]

সঊদী আরবের জাতীয় গবেষণা ও ফৎওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটি (লাজনা দায়েমাহ) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে, পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার

---

১৮. *মুসলিম হা/১৫১৩, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*

লেনদেন নিষিদ্ধ। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। পরিণামে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী বিপুল মুনাফা অর্জন করবে। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন ও লাভের হাতিয়ার মাত্র। এক্ষণে যেসব কারণে এ ধরনের ব্যবসা হারাম তা নিম্নরূপ :

১. সূদ (আর রিবা) : এই ব্যবসায় দুই প্রকার সূদই মওজুদ রয়েছে। একটি হ'ল সমজাতীয় বস্তুতে অতিরিক্ত নেওয়ার সূদ। অপরটি হ'ল একই বস্তুতে বাকীতে বেশী নেওয়ার সূদ। কোম্পানী যে পণ্য বিক্রয় করে ভোক্তার কাছে তা একটি ছল মাত্র। অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যও সেটা থাকে না।

২. প্রতারণা (আল-গারার) : গ্রাহক প্রত্যাশিত ভোক্তা সৃষ্টি করতে পারবে কি-না সে সম্পর্কে সে অনিশ্চিত থাকে। এই পিরামিড নেটওয়ার্ক যত লম্বাই হোক না কেন এক সময় তা শেষ হ'তেই হবে। এমতাবস্থায় গ্রাহক এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে যে, সে নেটওয়ার্কের উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে লাভবান হবে, না-কি নিম্ন অবস্থানে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেখা যায় যে, উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় গ্রাহক ব্যতীত অধিকাংশ পিরামিড সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা প্রতারণার শামিল, শরী'আতে যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(মুসলিম)*।

৩. বাতিলপন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ : এর মাধ্যমে কোম্পানী ও সংশ্লিষ্ট ক্রেতা-পরিবেশকগণ অন্যদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে লাভবান হয়। আল্লাহ বলেন, لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 'তোমরা বাতিল পন্থায় পরস্পরের মাল ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯)*।

৪. ধোঁকা, শঠতা ও অস্পষ্টতা : ব্যবসায়ে মানুষকে বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদর্শন করা হয়, যেখানে ব্যবসাই মূল উদ্দেশ্য। অথচ এখানে বাস্তবতা তার বিপরীত। উপরন্তু বিরাট লাভের টোপ দেয়া হয়, অথচ অধিকাংশ সময় তা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৯]

---

১৯. *মুসলিম হা/১০১, মিশকাত হা/৩৫২০।*

কেউ কেউ এ কারবারকে এজেন্সি বা ব্রোকারিজ চুক্তির ন্যায় দাবী করে। এটা ভুল। কেননা একজন ব্রোকার সরাসরি পণ্য বিক্রির মাধ্যমে কমিশন লাভ করে। অন্যদিকে এমএলএম কোম্পানী পণ্যের উপর নয়, বরং বাজারজাতকরণের উপর কমিশন দেয়। ব্রোকারের উদ্দেশ্য থাকে কেবল পণ্য বিক্রয়, আর এমএলএম কোম্পানীর উদ্দেশ্য পণ্য নয়, বরং মেম্বারশীপ বিক্রয় তথা ক্রেতা-পরিবেশক দল বৃদ্ধি করা। ব্রোকার কমিশন লাভ করে কোম্পানীর নিকট থেকে, আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং-য়ে কমিশন গ্রহণ করা হয় ক্রেতাদের নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অনেকে আবার এই কমিশনকে উপহার আখ্যা দেন যা সঠিক নয়। কেননা সকল উপহার শরী'আতে সিদ্ধ নয়। যেমন ঋণদাতাকে উপহার দেয়া সূদের পর্যায়ভুক্ত।[২০]

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসা অসম মূল্য নির্ধারণ ও অতিরঞ্জিত আয়ের প্রলোভন দেখানোর কারণে অভিযুক্ত হয়েছে। আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন ২০০৮ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রস্তাবিত ব্যবসায় সুযোগ সম্বন্ধীয় তালিকা থেকে এমএলএম কোম্পানীগুলোর নাম বাদ দিয়েছে। সংস্থাটি গ্রাহকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, নতুন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণ করার এই রীতি (এমএলএম) বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পিরামিড স্কীম পদ্ধতির ন্যায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(দ্রঃ Multi-level marketing-উইকিপিডিয়া)*।

তত্ত্বগতভাবেও এ ধরনের মার্কেটিং বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এ মার্কেটিং-কে বলা হয়েছে, 'MLM is like a train with no brakes and no engineer headed full-throttle towards a terminal' অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ গতিতে স্টেশনমুখী ধাবমান একটি ট্রেনের মত যার কোন ব্রেক নেই, নেই কোন চালক'।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ 'ব্যবসা' সমর্থন করা যায় না। কেননা একজন গ্রাহককে তার আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের বশীভূত করে পণ্য বিক্রয় করতে বলা হয়। ফলে গ্রাহক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে সম্পর্ক

---

২০. *দ্রঃ বুখারী হা/৩৮১৪, মিশকাত হা/২৮৩৩; লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং- ২২৯৩৫। তাং ১৪/০৩/১৪২৫ হিঃ।*

গড়ে তোলে। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থের কেন্দ্রে পরিণত করে। এ সম্পর্ক তখন হয়ে যায় যান্ত্রিক। নিষ্কলুষ বন্ধুত্বের স্থলে তখন সন্দেহ আর সংকীর্ণতাবোধ স্থান করে নেয়। নিজ গৃহ পরিণত হয় মার্কেট প্লেসে। যেকোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক এ কাজে ঘৃণাবোধ করবে।

এদেশের অনেক লোক সম্মানজনক পেশা ছেড়ে কাঁচা পয়সার নেশায় এ ধরনের তথাকথিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এদের শিকারে পরিণত হয়েছেন আলেমদেরও একটি অংশ। অনেকেই তাতে ফুলে ফেঁপে উঠছেন এবং সেই সাথে চলে যাচ্ছে তাদের ঈমানী জাযবা। সে স্থান দখল করছে নিরেট বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা। অথচ ইসলামী দর্শন হ'ল পুঁজি ব্যয় করা। এর বিপরীতে বস্তুবাদী দর্শন হ'ল পুঁজি সঞ্চয় করা, যা মানুষকে রক্তচোষা ক্বারূণের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ–

'হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল'।[২১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ، 'সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ'।[২২]

অতএব আমাদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, প্রশ্নে উল্লেখিত নামে বা অন্য নামে প্রচলিত এম.এল.এম ব্যবসাসমূহ শরী'আত সম্মত হবে না। জান্নাতপিয়াসী মুমিনকে এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

{সূত্র : মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০৮, প্রশ্নোত্তর নং ২/৮২}

---

২১. *বুখারী হা/৫২, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২।*

২২. *তিরমিযী হা/২৫১৮, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৩।*